Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

তৃতীয় বর্ষ-সংখ্যা ৩ -জুলাই ২০১৩

মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে দেবভূমি বিপর্যস্ত

বিশেষ নিবন্ধ

❖সাব অ্যাটমিক কণা এবং হিগ্‌স বোসন

❖জ্যোতিষ বিজ্ঞান নয় কুসংস্কার

সাক্ষাৎকার

হিগস বোসন এবং কণা পদার্থবিদ্যা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী ডঃ অমিতাভ রায় চৌধুরী

নারী নির্যাতন ও কুসংস্কার বিরোধী রচনা

এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত কলাম

সম্পাদকীয়

আই পি সি সি নীরব কেন?

এই বছর মার্চ মাস ছিল রাশিয়ার গত পঞ্চাশ বছরের শীতলতম মাস। মধ্য রাশিয়ায় তাপমাত্রা -২৫° সেন্টিগ্রেডে নেমেছে আর রাশিয়ার উত্তর ভাগের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল −৪৫° সে., গত পঞ্চাশ বছরে এটি ছিল রাশিয়ার শীতলতম বসন্ত। মস্কো শহরে মার্চের ১৫ দিন যাবৎ তাপমাত্রা -১৯° সেন্টিগ্রেডের উপরে ওঠেনি। তুষারপাতের পরিমাণ ছিল গড় তুষারপাতের দ্বিগুণ যার গভীরতা ছিল তিন মিটারেরও অধিক। এমনকি মার্চের শেষেও এর গভীরতা ছিল ৭০ সেমি যা গত ২০ বছরের সর্বোচ্চ। এপ্রিলেও রাশিয়ার বহু জায়গা তুষারাবৃত। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, রাশিয়ার শীত এবার এক মাসেরও অধিক দীর্ঘায়িত হয়েছে। পরিযায়ী পাখিরাও দক্ষিণ গোলার্ধ অভিযান শেষ করে নিজেদের ঘরে ফিরছে অনেক দেরীতে।

এমনিতে হাড় কাঁপানো শীতের জন্য রাশিয়ার বরাবরই বিখ্যাত কিন্তু এবারের শীত ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং ভারতকেও কাবু করেছে। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ-এ রেকর্ড তুষারপাত হয়েছে। মার্চের শেষের দিকেও বৃটেনের বহু জায়গা ছিল তুষারাবৃত। জনজীবন ছিল স্তব্ধ। উত্তর আয়ারল্যান্ডের হাজার হাজার জন্তু জানোয়ার প্রায় ছয় মিটার গভীর তুষারে চাপা পড়ে মারা গেছে। পোল্যান্ডে লক্ষাধিক বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল দীর্ঘদিন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে ১৯১০ সালের পর এবছরের মার্চ মাসটি ছিল দ্বিতীয় শীতলতম মাস। চীনে গত ৩০ বছরেও তাপমাত্রা এতটা নীচে নামেনি। ভারতের জলবায়ু বিভাগের প্রধান রাজেন্দ্র কুমার জেনামানি জানাচ্ছেন গত ৪৪ বছরের মধ্যে এটাই হল উত্তর ভারতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

এই ঘটনা সারা বিশ্বের আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছে। অধিকাংশ দেশের আবহাওয়াবিদদের ভবিষ্যৎবানীকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রকৃতির এই 'খামখেয়ালীপনা'য় বিজ্ঞানীমহলের অধিকাংশই যার পর নাই তিতিবিরক্ত এবং চিন্তিত। কারণ, বিশ্বব্যাপী ভূ-উষ্ণায়নের যে তত্ত্বকে এতদিন প্রচার করা হয়েছে অর্থাৎ মনুষ্যজনিত কারণে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা নির্দয়ভাবে বৃদ্ধি পাবার যে তত্ত্ব, তাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক হ্রাস পেয়ে যাওয়া এবং তার জেরে দক্ষিণ গোলার্ধেও তাপমাত্রা হ্রাস পাবার প্রবণতা বিজ্ঞানীমহলকে ভাবিয়ে তুলেছে।

এর কারণ হিসাবে নিজেদের ভূউষ্ণায়নের তত্ত্বের সাফাই গাইতে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন এই অস্বাভাবিক শীতলায়ন উত্তর মেরুতে অস্বাভাবিক বায়ু চাপ সৃষ্টির কারণেই ঘটেছে। এর ফলে মেরু অঞ্চল থেকে ঠান্ডা বায়ু স্রোত দক্ষিণদিকে ধাবমান হয়েছে যা ইদানিংকালে সুমেরু বরফের দ্রুত গলনের সঙ্গেই সম্পর্কিত এবং এটা ভূ-উষ্ণায়ন তত্ত্বকেই সমর্থন করে।

এদিকে বৃটিশ আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, আগামী বছরগুলিতে ভূ-উষ্ণায়ন আপাতত ছুটিতে যাচ্ছে। বৃটিশ আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের এহেন পূর্বাভাস বিজ্ঞানীমহলে এক অন্য তাৎপর্য্য বহন করছে। কারণ এই বৃটিশ আবহাওয়া বিজ্ঞানীরাই এতদিন মনুষ্যজনিত ভূউষ্ণায়নের পক্ষে কড়া সওয়াল করে এসেছেন। বিজ্ঞানী মহলের এক অংশ দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছেন যে মনুষ্যজনিত ভূউষ্ণায়ন তত্ত্বের অন্যতম রূপকার বৃটিশ বিজ্ঞানীরা আসলে একটা রাজনৈতিক মতের পক্ষেই সওয়াল করছেন। বিবিসি-র আবহাওয়া বিষয়ক প্রতিনিধি পল হাডসন মজা করে বলেছেন, ভূতাপমাত্রা সংক্রান্ত পূর্বাভাসগুলি ভূউষ্ণায়নের চেয়েও উত্তপ্ত। গত ১২ বছরের ১২টি পূর্বাভাসের মধ্যে ১১টি ছিল আনুমানিক তাপমাত্রার থেকে অনেক বেশী।

তিন বছর পূর্বে বৃটিশ আবহাওয়া দপ্তরের জলবায়ু-পূর্বাভাস ও গবেষণা কেন্দ্র, 'হ্যাড্‌লী সেন্টার'-এক

কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ক্লাইমেটগেট' কেলেঙ্কারি। ঐ কেলেঙ্কারির সূত্রপাত হয় যখন একদল কম্পুউটার হ্যাকার, বৃটিশ আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের পারস্পরিক আদান-প্রদান করা একগুচ্ছ ই-মেল সাধারণ মানুষের কাছে ফাঁস করে দেয়। ঐ ই-মেল পাঠ করে দেখা যায় বৃটিশ আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা কিভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিসংখ্যানগুলি অদল বদল করে দিয়ে মনুষ্যজনিত ভূউষ্ণায়নের তত্ত্বকে ধীরে ধীরে যুক্তি গ্রাহ্য করার চেষ্টা করছে এবং ঐ তত্ত্বের সমালোচকদের যুক্তিকে দাবিয়ে দিচ্ছে।

এই ঘটনাবলী, রাশিয়ান আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মনুষ্যজনিত ভূউষ্ণায়নের তত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান করে তুলেছে। রাশিয়ান এ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের এক বক্তৃতায় ইন্সটিটিউট অফ জিওগ্রাফির প্রধান ভ্লাদিমির কোটলিয়াকভ বলেছেন, 'এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর তাপমাত্রা কেবল বৃদ্ধিই পেয়ে যাবে এমনটা মনে করার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। ভূশীতলায়নের প্রাথমিক লক্ষণগুলি বেশ পরিষ্কার হচ্ছে এবং আগামী বছরগুলিতে তা আরও প্রকট হবে।' তিনি আরও বলেন 'মনুষ্যক্রিয়াকলাপের এবং শিল্পক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণের প্রভাবে প্রকৃতির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ঠিকই তবে প্রকৃতির শক্তিও তার থেকে অনেক বেশী। প্রকৃতিতে উষ্ণায়ন এবং শীতলায়ান পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়, আবার শুষ্কতা ও আর্দ্রতা পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকার সৌর পদার্থ বিজ্ঞানীরাও ভূউষ্ণায়নের ব্যাপারে এমন ধারণাই পোষণ করেন।

বর্তমান পৃথিবীর পরিবর্তিত আবহাওয়া সেই পুরানো বিতর্ককে উস্কে দিয়েছে। যে বিতর্কের প্রধান অক্ষই ছিল – ভূউষ্ণায়ন প্রাকৃতিক না মনুষ্যসৃষ্ট ? এই বিতর্কের সঠিক বৈজ্ঞানিক সমাধানের জন্য কোনও কার্যকরী এবং সৎ প্রয়াস বিজ্ঞানীমহল না রাখলেও, কোন কোন বিজ্ঞানী মহল বর্তমান ভূউষ্ণায়ন যে মনুষ্যজনিত কারণেই হচ্ছে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য মরিয়া।

বিশ্বব্যাপী এই অবৈজ্ঞানিক কর্মকান্ডের নেতৃত্বদায়ী ভূমিকায় রয়েছে আই পি সি সি যা ইউ এন ও'র একটি শাখা সংগঠন। যার কাজই হল বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের নিরীখে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা, মানুষকে পরিবেশ সচেতন করে তোলা ইত্যাদি। স্বভাবতই এই সংগঠনটি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং পরিবেশ বিষয়ে লাগাতার বৈজ্ঞানিক গবেষণা না চালালে এই পরামর্শদান ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। তবে ভূউষ্ণায়ন বিষয়ক বহুল প্রচারিত তত্ত্বের প্রশ্নে আই পি সি সি'র বিজ্ঞানী মহলও দ্বিধাবিভক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভারতের ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজি'র বিজ্ঞানীরা হিমালয় পর্বতমালায় ভূউষ্ণায়নজনিত প্রভাবের প্রচলিত তত্ত্বকে খারিজ করে দিয়েছে যা এই সংখ্যায় পৃথক রচনায় প্রকাশ করা হল।

ইদানীং ফাঁস হয়ে যাওয়া ক্লাইমেট গেট কেলেঙ্কারী এই আশঙ্কাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে।

স্বাভাবিকভাবেই কতকগুলি প্রশ্ন উঠে আসে – এক, ইদানীংকালে মনুষ্যজনিত কারণে বায়ুমন্ডলে কি কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পেয়েছে ? সকল বিজ্ঞানীর উত্তর – 'না'। অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধি পেলেও ভূশীতলায়ন সম্ভব। দ্বিতীয় প্রশ্ন, তাহলে এতদিন ধরে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের একাংশ এই যুক্তির পক্ষে সওয়াল করে আসছিলেন কিসের ভিত্তিতে? ঐ পরিবেশবাদীরা কি পরিবেশকে একটি নিশ্চল পদার্থ হিসাবেই মনে করেন? পরিবেশে স্থিতিশীল নয় বরং গতিশীল সাম্য বিরাজ করছে – এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটি তাঁরা কি অস্বীকার করেন? তাঁরা কি মনে করেন পরিবেশে পজিটিভ ফিডব্যাক ও নেগেটিভ ফিডব্যাক-এর প্রভাব একেবারেই নেই? তৃতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ভূউষ্ণায়ন ও ভূশীতলায়নের কারণ হিসাবে ভূবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে মহাজাগতিক কারণটিকে প্রধান (প্রায় ৯৯%) কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং যা 'মিলানকোভিচ চক্র'-এর মাধ্যমে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, পরিবেশবাদীরা তা অস্বীকার করেন কোন যুক্তিতে? এই প্রশ্নে বৃটিশ আবহাওয়াবিদরা ও বহু পরিবেশবাদী সংগঠন ঢোঁক গিলেছেন। তবে বিজ্ঞান মনস্ক মানুষজন – সাবধান। যে পুঁজিগোষ্ঠী ভূউষ্ণায়নকে সামনে রেখে বিশ্ব বাজার সৃষ্টির খোয়াব দেখেছেন, ভূশীতলায়ন হলে তারা যে ঘুমিয়ে থাকবেন এমন ভাবনার কোনও কারণ নেই। আই পি সি সি নীরব কেন? নীরবতা ভাঙ্গুন। নীরবতা বিজ্ঞানীদের শোভা পায় না।■

মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে দেবভূমি বিপর্যস্ত

গত ১৬ই জুন ২০১৩ থেকে শুরু হওয়া মেঘ ভাঙা বৃষ্টি (ক্লাউড বার্স্ট) এবং হরপা বান (ফ্ল্যাশ ফ্লাড)-এর ঘটনায় উত্তর ভারতের উত্তরাখন্ড এবং হিমাচল প্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভেঙে চুড়ে তছনছ হয়ে গেছে। সরকারী খবর অনুসারেই দশ হাজারের বেশী মানুষ মৃত, নিখোঁজ অসংখ্য। উত্তরাখন্ডের দেবভূমি বলে পরিচিত গাড়োয়ালের কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, চামোলী, উত্তরকাশী সহ বহু অঞ্চলে পাহাড় ভেঙে ও জলের তোড়ে হোটেল, ধর্মশালা, রাস্তা, ব্রীজ, মন্দির এবং তাতে অধিষ্ঠিত দেবতা, লক্ষ লক্ষ মানুষ, ঘর বাড়ি কেউ রেহাই পায়নি। হিমাচল প্রদেশে সিমলা, আংলা, পিও অঞ্চলেও প্রায় একই অবস্থা যদিও হতাহতের সংখ্যা সেখানে কম। সেনাবাহিনীর জওয়ান এবং স্বেচ্ছাসেবী উদ্ধারকারীরা অমানুষিক পরিশ্রম করে অসংখ্য মানুষকে উদ্ধার করেছেন। মন্দাকিনী, অলকানন্দা এবং গঙ্গা বক্ষে তৈরী হওয়া ১২টি বাঁধ ও জলাধার ভেঙে গেছে, ধৌলিগঙ্গা এবং কালিগঙ্গার মত জল বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি ডুবে গেছে, রাজ্যের শ্রীনগর শহরের অর্ধাংশ কাদায় ডুবে গেছে। এই 'হিমালয়ান সুনামি' কার্যত ধ্বংস করে দিয়েছে পর্যটন শিল্পের কেন্দ্রস্থলকে। খবরের কাগজ ও টেলি মিডিয়া পর্যটক এবং মন্দিরের দুর্ভোগ ও বেহাল অবস্থা নিয়ে প্রচুর কথা বললেও স্থানীয় মানুষের দুরাবস্থার কথা সংবাদে প্রায় স্থানই পায়নি।

কেন এমন হল?

সাধু সন্ত এবং ঈশ্বরবাদীরা বলছেন ঘোর কলি। মানুষের পাপে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেছে তাই ঈশ্বর এবার সব ধ্বংস করবেন, এ তাঁরই লীলা। পরিবেশবাদী এবং বিশেষ করে 'মনুষ্যজনিত উষ্ণায়ন এবং তার ফলশ্রুতিতে জলবায়ুর পরিবর্তন' এই তত্ত্বের প্রবক্তা ও প্রচারকরা ঘটনার জন্য মনুষ্যজনিত উষ্ণায়নকে দায়ী করছেন। আর বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ এবং সমাজকর্মীরা ঘটনার বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজছেন এবং অবৈজ্ঞানিক নগরায়ন, বিল্ডিং নির্মাণ, রাস্তা, বাঁধ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা, ইচ্ছা মত গাছ পালা কাটা ইত্যাদিকে দায়ী করছেন।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতামতের ভিত্তিতে আসুন বস্তুনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞানমনস্ক মনন নিয়ে এই ভয়াবহ ঘটনার বিশ্লেষণ করি এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের দুর্যোগ প্রতিরোধের দিশা খুঁজে বের করি।

ভারতের উত্তর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল পৃথিবীর মহাদেশীয় অঞ্চলের দীর্ঘতম এবং উচ্চতম হিমালয় পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত। ভৌগোলিকভাবে এবং চলতি কথায় সমগ্রটাকেই আমরা হিমালয় বললেও ভূতাত্ত্বিকভাবে উত্তরাখন্ড, নেপাল, ভূটানের দক্ষিণ অংশের পর্বতমালার নাম শিবালিক পর্বতমালা, যা হিমালয়ের চেয়েও নবীন নদী বাহিত পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত এবং কম উচ্চতার। অন্যদিকে হিমালয় টেথিস সমুদ্রে সঞ্চিত পলি দ্বারা গঠিত সুউচ্চ ভঙ্গিল পর্বতমালা। এই হিমালয় এবং তিব্বতের মালভূমি পৃথিবীর জনসংখ্যার একের পঞ্চমাংশের বেশী মানুষকে মিষ্টি জল সরবরাহ করে থাকে। গোটা পৃথিবীতে বর্তমানে যত পলিসঞ্চয় হয় তার এক চতুর্থাংশ সরবরাহ করে হিমালয়, তিব্বতের মালভূমি এবং শিবালিক পর্বতমালা। ভূতাত্ত্বিকভাবে এই অঞ্চল প্রচন্ড

অস্থিতিশীল। কারণ এটি একটি প্লেট সীমান্ত অঞ্চল (কনভার্জেন্ট প্লেট বাউন্ডারি) এবং এখানে দুটি মহাদেশীয় প্লেটের নিয়ত সংঘর্ষ চলছে এবং ভারতীয় প্লেট ইউরেশীয় প্লেটের দিকে গড়ে বছরে প্রায় ৫ সেমি বেগে ধাবিত হচ্ছে এবং তার ফলে কুঞ্চিত হয়ে হিমালয় বছরে ২-১০ মিমি উচ্চতায় বাড়ছে (নাঙ্গা পর্বত অঞ্চলে গড়ে সর্বাধিক ১০ মিমি উচ্চতায় বাড়ছে)। একই সাথে উচ্চতাবৃদ্ধির পাশাপাশি হিমালয়ের গড়ে বছরে ২-১২ মিমি ক্ষয় সাধনও হচ্ছে। হিমালয়ের বড় অংশই মেঘের উচ্চতার অনেক বেশী এবং যার মাথাগুলি হিমবাহে ঢাকা। এই হিমবাহগুলির ৩০-৪০ শতাংশ বছরের কোন সময়ই গলে না কারণ এগুলি সমুদ্রতল থেকে ৪০০০ মিটারেরও বেশী উঁচুতে। এই কারণে হিমালয়কে হিমের আলয় (হিমবাহের স্থায়ী বাসস্থান) বলা হয়।

ভূতাত্ত্বিকভাবে হিমালয় প্লেট সীমান্ত অঞ্চল বলে ভয়ঙ্কর রকম ভূকম্প প্রবণ। এখানে অসংখ্য চ্যুতি-তল (ফল্ট প্লেন) রয়েছে, অতি নবীন এই পর্বতমালার পাহাড়গুলির মধ্যে রয়েছে গভীর ফাটল এবং যার বেশীরভাগই জলে পরিপূর্ণ (স্যাচুরেটেড উইথ ওয়াটার)। পাহাড়ি ওক, পাইন, দেবদারু প্রভৃতি গাছগুলি গভীর শিকড় দিয়ে জল ধরে রাখে। এখানকার পাথর প্রধানত পাললিক শিলায় তৈরী এবং তাতে প্রচুর ফাটল থাকায় ভঙ্গুর। ভূমির ঢাল খুব বেশী হওয়ার এবং পাথরের ফাটল বরাবর অভিকর্ষ বলজনিত জলের নিম্নমুখী চাপে পাহাড়ে ধস নামা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। এই ধস নামার ঘটনা অঞ্চলভেদে আলাদা মাত্রায় হয় স্থানীয় পাথরের ভূতাত্ত্বিক গঠনের উপর। নদীগুলি গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় এবং তার পাড় (ন্যাচারাল লেভি) এবং প্লাবনভূমি (ফ্লাড প্লেন) সংকীর্ণ। এই কারণে নদীখাতে জলের পরিমাণ বেড়ে গেলে এবং জমির ঢাল পাল্টালে নদীও অতিরিক্ত জল ধারণ করতে পারে না, প্রবল বেগে দুকূল ভাসিয়ে চলে যায়। একেই হড়পা বান বলে।

আবহবিজ্ঞানী গণেশ কুমার দাস বলেছেন (এই সময় পত্রিকা ২০শে জুন ২০১৩) "গত সপ্তাহে যে নিম্নচাপটি এ রাজ্যে বৃষ্টি দিয়েছে, সেটি রবিবার (অর্থাৎ ১৬ই জুন) নাগাদ মধ্য ভারত পেরিয়ে আরও পশ্চিম দিকে সরে যায়। তার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর তো বটেই, আরব সাগর থেকেও জলীয় বাষ্প ঢুকেছে উত্তর ভারতে। গুজরাট-রাজস্থানের উপর থাকা একটি ঘূর্ণাবর্তও আরব সাগর থেকে জলীয় বাষ্প টেনেছে। এর মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরের উপর একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা চলে আসে। জোলো বাতাস জুগিয়ে গিয়েছে সেটিও'। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার 'জঠর' ভূমধ্যসাগর। সেখান থেকে ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান হয়ে কাশ্মীরে ঢোকে এই 'এক্সট্রাট্রপিক্যাল স্টর্ম'। মূলত, শীতকালেই ঝঞ্ঝার আনাগোনা বেশি থাকলেও, জুনে তার আগমন একেবারে অস্বাভাবিক নয়।

ঘটনা হল, এতগুলি প্রাকৃতিক অবস্থা কাছাকাছি চলে আসায় ঝেঁপে বৃষ্টি নামা ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। আর সেটাই হয়েছে। রবিবার ২৪ ঘন্টায় দেরাদুনে বৃষ্টি হয়েছে ৩৭০ মিলিমিটার (গোটা জুন মাসে কলকাতায় বৃষ্টি হয় গড়ে ২৮৩ মিলিমিটার)। উত্তরাখণ্ডের রাজধানীতে জুনে একদিনে এতটা বৃষ্টি (আগের রেকর্ড ১৮৮ মিলিমিটার, ২৮শে জুন, ১৯২৫) আগে কখনও হয়নি। উত্তর কাশী, হরিদ্বারেও ২০০ থেকে ২৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কম-বেশি বৃষ্টি হয়েছে পরের দু'দিনও। বেসরকারি আবহাওয়া সংস্থা 'স্কাইমেট'-এর মুখ্য

আবহবিদ মহেশ পালওয়াতের কথায়, 'প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকে পড়ায় দিল্লি, হরিয়ানা, পঞ্জাব সর্বত্র বৃষ্টি হয়েছে। উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ সেহেতু পাহাড়ঘেরা, তাই এখানে জলীয় বাষ্প একবার ঢুকে পড়লে আর বেরোনোর জায়গা পায় না। তখন তা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যায়। ঠান্ডা হয়ে মেঘ জমাট বাঁধে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আবার পরিমণ্ডলের উপরিস্তরে বাতাসের গতিবেগ বেশি না-থাকায় মেঘ খুব একটা নড়াচড়া করতে পারেনি। ছোট জায়গাতেই প্রায় ১২-১৫ কিলোমিটার উঁচু উল্লম্ব মেঘ ভেঙে (ক্লাউড বার্স্ট) পড়েছে। সমতল হলে ওই বৃষ্টির জলে বড়জোর দিনকয়েক জলমগ্ন থাকত সংশ্লিষ্ট এলাকা ও আশপাশের অঞ্চল। কিন্তু পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় মেঘ-ভাঙা জল সামনে যা পেয়েছে, তা-ই ভাসিয়ে নীচের দিকে ছুট দিয়েছে। নেমেছে হড়পা বান। ক্ষতির খতিয়ান তাই এত বেশি।"

এই অস্বাভাবিক বৃষ্টি প্রসঙ্গে ইন্ডিয়ান মিটিওরলজিক্যাল

ডিপার্টমেন্ট, দিল্লির ডাইরেক্টর জেনারেল এল এস রাঠোর তাঁদের ওয়েব সাইটে জানিয়েছেন যে এই ভয়াবহ বৃষ্টিপাত কতগুলি প্রাকৃতিক ঘটনার ফলশ্রুতি। তিনি জানান যে তাঁর টীম সঠিকভাবে এই অঞ্চলে "উচ্চমাত্রা থেকে অতি উচ্চমাত্রার" বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছিল ১৪ই জুন ২০১৩ তারিখে। অর্থাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার ৪৮ ঘন্টা আগেই। জুন মাসের প্রথম ১৮ দিনে এই অঞ্চলে ৪৪০% অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে।

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর এই অঞ্চলে "উচ্চ থেকে অতি উচ্চমাত্রায়" বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিলেও তাদের হাতে পূর্বাভাস দেওয়ার অত্যাধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন ডপলার এফেক্ট র‍্যাডার যন্ত্র থাকলে তারা আরও সুনির্দিষ্টভাবে পূর্বাভাস করতে পারত মেঘভাঙা বৃষ্টির ঘটনা সহ, যাকে এখন বলা হয় 'নাওকাস্টিং' বা এক্ষুণি কী ঘটতে চলেছে তা বলে দেওয়া।

পরিবেশবিদদের একাংশ, বিশেষত যারা মনুষ্যজনিত ভূ-উষ্ণায়ণের জন্যই সব প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে মনে করেন, তারা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতার কারণ হিসাবে হিমালয়ের হিমবাহগুলির অতিরিক্ত গলনকেই দায়ী করেছেন। এর জবাবে ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজির হিমবাহ বিশেষজ্ঞ (গ্লেসিওলজিস্ট) ডি পি দোবহাল বলেছেন যে এই অঞ্চলের হিমবাহগুলি নিয়ে তিনি বিগত কয়েক দশক ধরে কাজ করছেন এবং তাঁর মতে "হিমবাহগুলি এই দুর্যোগের সাথে কোনওভাবেই সম্পর্কিত নয়।" তিনি আরও বলেন "অনেকে বলছেন কেদার ডোমের জমা বরফ ভেঙে প্রাকৃতিক হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই হ্রদের জল পাড় ভেঙে প্লাবন সৃষ্টি করেছে। আমি কেদারনাথের উত্তরের চোরাবারি হিমবাহ পর্যক্ষেণ করেছি। এটিতে কোনও ভাঙন হয়নি এবং ওখানকার হ্রদটি জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শক্ত ও জমাট বরফের ছিল। এটা কোনওভাবেই বন্যার কারণ হতে পারে না।"

হিমালয়ের মত সুউচ্চ পর্বতে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বান কি নতুন?

বিগত ৩ দশকে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা তা বার বার প্রত্যক্ষ করেছি। ভূতাত্ত্বিকদের মতে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা সৃষ্টির পর এই ধরনের ফ্ল্যাশ ফ্লাড-এর প্রমাণ পাথরের খাঁজে খাঁজে কয়েক লক্ষ বছর ধরেই পাওয়া যায়। এটি কোন অপ্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এই ঘটনার কারণ বিজ্ঞানীরা বহু পূর্বেই আবিষ্কার করেছেন।

সমগ্র ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে এই প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ ও সম্ভাব্যতা যখন জানা ছিল তখন মানবজীবনের

এতবড় ক্ষতি হল কেন?

ভারতের আবহাওয়া দপ্তর থেকে বৃষ্টি শুরুর ৪৮ ঘন্টা আগে "উচ্চ থেকে অতি উচ্চ মাত্রায়" বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসকে কাজে লাগানো হল না কেন? এন ডি টি ভি-র এক প্রশ্নের উত্তরে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বলেন "প্রতিবছরই এমন বৃষ্টি হয়। এবার ক্লাউড বার্স্ট-এর কোনও পূর্বাভাস ছিল না এটা আরও সুনির্দিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন ছিল।" তিনি বলেন যে এই সময় উত্তরাখণ্ডে 'চারধাম যাত্রায়' হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন। সরকার কিভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সতর্ক করবে। সরকার আকাশ পথে যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ন্যাশনাল ডিসাসটার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এন ডি এম এ) কর্তারা বলেছেন যে এবার আবহাওয়া দপ্তর থেকে অতিবৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও কয়েকদিনের মধ্যে ৪৫০% অধিক বৃষ্টি হবে তা জানা ছিল না। আবহাওয়া দপ্তরের কাছে ১৫ কোটি টাকা দামের উচ্চ প্রযুক্তির ডপলার র‍্যাডার সিস্টেম থাকলে ক্লাউড বার্স্ট বা ভয়াবহ ঝড়ের সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস করা যেত।

অর্থাৎ কী করলে পূর্ণ সমাধান করা যেত জেনেও তা করা হয়নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও যে প্রযুক্তি মানুষ বাঁচাতে পারত তা গ্রহণ করা হয়নি। এই কথাটা যেন ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে হওয়া সুনামি'র সময়কার প্রতিধ্বনি। তখনও বলা হয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় সুনামি সতর্কীকরণ প্রযুক্তি না থাকার কারণে মানুষ বাঁচানো যায় নি।

সমস্ত বিজ্ঞানী এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে ব্যাঙের

ছাতার মত অবৈজ্ঞানিক স্থাপত্য, অপরিকল্পিত নগরায়ন, ঘরবাড়ি ও নগরায়নের জন্য যথেচ্ছভাবে গাছ পালা কেটে ফেলা, অবৈজ্ঞানিকভাবে এবং অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা, ব্রীজ নির্মাণ, হিমালয়ের ভূতাত্ত্বিক গঠন জানা সত্ত্বেও তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবৈজ্ঞানিক বাঁধ-জলাধার-জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ – এসবগুলির জন্যই হাজার হাজার জীবন গেল, এত সম্পদ ধ্বংস হল। দেবভূমির দেবতারা তাদের বাসস্থান (মন্দির) সহ লোপাট হয়ে গেছেন মানুষকে রক্ষা করবেন কি! (যদিও ঈশ্বরবাদীরা এখন বলছেন এটাও নাকি তাঁরই ইচ্ছায় হয়েছে।) তথাকথিত দেবভূমি এখন ধ্বংসস্তূপ আর শ্মশানে পরিণত।

ভূবিজ্ঞানী, আবহাওয়া বিজ্ঞানী, স্থাপত্য বিজ্ঞানী তথা পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই অঞ্চলে এই ধরনের কর্মকান্ড চালানোর এত বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এমনটা হল কেন? তবে এত সব দপ্তরের প্রয়োজন কি? অবৈজ্ঞানিক কাজগুলিকে শীলমোহর দেওয়ার জন্য কি?

সব জানা সত্ত্বেও এমন হল কেন?

হিমালয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সরকার ও প্রশাসনিক মহলে বহুবার জানিয়েছেন। তবুও অবৈজ্ঞানিক কাজগুলি বন্ধ হয়নি বরং উত্তরোত্তর বেড়েছে। এর কারণ একটাই। তা হল এখানকার পর্যটন শিল্পে মুনাফা, অতি উচ্চহারে মুনাফা। এই মুনাফার তাগিদেই ছোট, মাঝারি, বড়, অতি বৃহৎ শিল্প মালিকরা এখানে বিনিয়োগ করে আসছেন। এই মুনাফার লক্ষ্যে মানব সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক কাজ করতেও কেউ পিছপা হননি। সকলেই এখন ভাগ্য আর প্রকৃতিকে দায়ী করে নিজেদের দায় এড়াতে চাইছেন। ত্রাণকার্য নিয়ে দলবাজি করছেন। একে অপরকে দোষারোপ করে জনমত নিজেদের দিকে ঘোরাতে চাইছেন।

এই দুর্যোগে হাজার হাজার মানুষের জীবন গেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃস্ব হয়েছেন বটে তবে সকলেই এতে অখুশী নয়। 'দেবভূমি' পুনর্গঠনের কাজে এখন বিনিয়োগ হবে কোটি কোটি টাকা। সেই কাজের জন্য আবার এসেছে মুনাফার সুযোগ। তাই শুধু দু ফোঁটা চোখের জল ফেলে, ত্রাণ শিবিরে দান করে এই সমস্যা থেকে বেড়িয়ে আসা যাবে না। বিজ্ঞান মনস্ক মন নিয়ে মানুষকে এই বিপর্যয়ের কারণ সম্বন্ধে সচেতন করাটাই এই মুহূর্তের কাজ। ■

হিমালয়ের হিমবাহের গলন প্রসঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়ণের তত্ত্ব খারিজ করলেন বিজ্ঞানীরা

ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজির ডাইরেক্টর ড. এ কে দুবে সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হিমবাহের গলনের জন্য বহু চর্চিত এবং তথাকথিত মনুষ্যজনিত কারণে বিশ্ব উষ্ণায়ণের তত্ত্বকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন "হিমালয়ের হিমবাহগুলি যথেষ্ট নিরাপদ অবস্থানে আছে এবং তার কোনও অস্বাভাবিক গলন হয় নি"। তিনি বলেন "হিমালয়ের হিমবাহগুলির আকার ও আয়তন আঞ্চলিক তুষাপাতের উপর নির্ভর করে, বাহ্যিক কারণ হিসাবে মনুষ্যজনিত উষ্ণায়ণের উপর নয়। এ প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট মতামত দিতে গেলে অন্তত পক্ষে ৩০ বছরের ধারাবাহিক গবেষণার প্রয়োজন। ব্রিটিশ ওয়েদার অবজারভেটারি স্টাডিজ কর্তৃক বিগত ১৪০ বছরের বেশী সময় ধরে উত্তরাখন্ডের আলমোড়ার কাছে মুক্তেশ্বর (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৩১১ মিটার উঁচুতে অবস্থিত) গবেষণা কেন্দ্রে তাপমাত্রার হিসাবে দেখা গেছে যে এই সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ৪° সেলসিয়াস কমেছে।"

তিনি বলেন যে আজ পর্যন্ত হিমবাহ নিয়ে যত পূর্বাভাস করা হয়েছে তা সবই অল্প সময়ের গবেষণার ভিত্তিতে। হিমালয়ের হিমবাহ প্রসঙ্গে এগুলি প্রযোজ্যই নয়। তিনি বলেন "আমাদের হিমবাহগুলি হল দৈত্যাকার উচ্চ উচ্চতার হিমবাহ এবং তা ৪০০০ মিটার বা তার উপরে অবস্থিত যেখানকার গড় তাপমাত্রা মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস। হিমালয়ের হিমবাহগুলির সাথে আল্পস বা আলাস্কার হিমবাহের কোনও তুলনাই করা চলে না কারণ সেগুলি প্রায় সমুদ্রতলে অবস্থিত।"

তিনি বলেন যে ১৯৯১ সাল থেকে তাঁর ইন্সটিউট হিমালয়ের হিমবাহগুলি নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা চালিয়ে আসছেন এবং বিগত ২০ বছরে এই হিমবাহগুলির কোনও ধারাবাহিক পশ্চাদ্ অপসরণ দেখা যায় নি। কখনও সখনও হিমবাহের পশ্চাদ্ অপসরণ বেড়েছে ঠিকই কিন্তু গড়ে তা যথেষ্ট নিরাপদ অবস্থানে আছে।

ওই ইনস্টিটিউটের প্রখ্যাত হিমবাহ বিশেষজ্ঞ ড: ডি পি দোবহাল বলেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শীতের মরশুম সম্প্রতি ছোট হয়েছে বটে তবে এই অঞ্চলে হিমবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রধানত স্থানীয় তুষারপাতের উপর নির্ভর করে। ■

সাক্ষাৎকার

হিগস বোসন এবং কণা পদার্থবিদ্যা কী ?

বিজ্ঞানী ডঃ অমিতাভ রায় চৌধুরী

[হিগস বোসন এবং কণা পদার্থবিদ্যা নিয়ে ইদানিং বহু আলোচনা চলছে। মিডিয়া প্রচার করেছে বিজ্ঞানীরা 'ঈশ্বরকণা' আবিষ্কার করেছে। ভাববাদীরা প্রচার করছে যে এই আবিষ্কার সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করল। অত্যন্ত জটিল এই সর্বাধুনিক বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের মত করে জানতে আমরা গত ২৪শে জুলাই গিয়েছিলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের ক্যাম্পাসে। সেখানে বিজ্ঞানী **ডঃ অমিতাভ রায় চৌধুরী** অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ডঃ অমিতাভ রায় চৌধুরী বর্তমানে এমেরিটাস অধ্যাপক হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত এবং দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ কণা পদার্থ বিজ্ঞানী হিসেবে বিখ্যাত। এই শাখায় কর্মরত বহু বিজ্ঞানীই তাঁর ছাত্র। তাঁর এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। আশাকরি পাঠকদের কাছে এই সাক্ষাৎকার তাঁদের আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণাগুলির প্রতি আগ্রহী করে তুলবে। – সম্পাদকমন্ডলী, সমীক্ষণ]

সমীক্ষণ ঃ আমাদের পত্রিকার নাম সমীক্ষণ। বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমরা ইন্টারভিউ নিয়ে থাকি। এই সংখ্যার জন্য হিগস-বোসন সম্বন্ধে জানতে আপনার কাছে এসেছি।

অধ্যাপক অমিতাভ রায় চৌধুরী ঃ বলুন, কী জানতে চান?

সমীক্ষণ ঃ হিগস বোসন কণা যে আবিষ্কার হল বলা হচ্ছে, এই হিগস-বোসন কি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ প্রথমেই বুঝতে হবে – কণা পদার্থবিদ্যা কী? কণা পদার্থবিদ্যায় হিগস-বোসন হচ্ছে একটা নতুন আবিষ্কার। কণা পদার্থবিদ্যা ডিল করছে পরমাণুর বেসিক কনসটিটিউয়েন্স কী – সেটা জানার জন্য। যেমন ধরুন আমরা ক্রিস্টাল সম্পর্কে জানি। এক্স-রে দিয়ে ক্রিস্টাল সম্পর্কে জানা যায়। কিংবা ধরুন ক্রিস্টালের পরের ধাপ হচ্ছে মলিকিউল এবং এটম। এগুলো সম্বন্ধে আমরা জানি। কিন্তু এগুলো কোনটাই মৌলিক কণা নয়। মলিকিউল এটম দিয়ে তৈরী। এটম আবার তৈরী প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন – এগুলো দিয়ে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে – এদের মধ্যে মৌলিক কে? ইলেকট্রন একটা মৌলিক কণা। আর প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে আছে কোয়ার্ক, সেগুলি মৌলিক কণা। এই যে মৌলিক কণা, এদের নিজেদের মধ্যে ইন্টার‍্যাকশন বা পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া – এই সমস্ত নিয়ে একটা থিয়োরি আছে। থিয়োরিটার নাম হচ্ছে **স্ট্যান্ডার্ড মডেল (SM)**। এটা নিয়ে প্রায় ১৯৬৭ সাল থেকে কাজ হচ্ছে। বহু বৈজ্ঞানিক অনেক কাজ করেছেন। তার মধ্যে অন্তত দশ-বারোজন নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। নানাভাবে SM-কে পরীক্ষা করা হয়েছে। যেকোন বৈজ্ঞানিক থিয়োরি, পরীক্ষিত হওয়া দরকার। কিছু প্রোপারটি এমন থাকবে সেটা পরীক্ষা করে বলা যাবে – এই থিয়োরি ঠিক কি ভুল।

যদি পরীক্ষা না করা যায়, যেমন ধরুন – ভগবান কি আছেন? এটাকে সায়েন্টিফিক থিয়োরি বলা যাবে না। কারণ, এটা পরীক্ষা করে কখনো প্রমাণ করা যাবে না – ঠিক কি ভুল।

স্ট্যান্ডার্ড মডেল (SM) তার অনেকগুলো সেই ধরনের

প্রোপারটি সাজেস্ট করেছিলো যা পরীক্ষা করা যাবে এবং সেইগুলো সমস্তই পরীক্ষা করে মিলে গেছে। তাই এখন পর্যন্ত যতদূর জানি, প্রায় সবক্ষেত্রে SM ঠিক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু SM-এর একটা ছোট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে – এই সমস্ত মৌলিক কণার মান অর্থাৎ ভর কোথা থেকে এলো? SM তৈরী হওয়ার সময় এটা একটু ধোঁয়ার মধ্যে ছিল। পিটার হিগস ও অন্যান্যরা এর একটা উপায় বের করেছিলেন যে, একটা ভাবে এগুলোর ভর তৈরী করা যেতে পারে। এখন সেই মেকানিজমটাই [হিগস মেকানিজ্‌ম] কাজ করছে কিনা, এটা জানতে পরীক্ষা করা হচ্ছে। তাঁরা দেখালেন হিগস-বোসন বলে একটা কণা থাকবে, যা মৌলিক কণা।

কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সেই হিগস বোসন আমরা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে তৈরী করতে পারিনি। এই গতবছর প্রথম হিগস বোসন পরীক্ষা করে পাওয়া গেল। এটা হচ্ছে হিগস বোসনের ব্যাকগ্রাউন্ড।

সমীক্ষণ ঃ হিগস বোসনে পিটার হিগসকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, বোসকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না – বিষয়টা কি এরকম? হিগস বোসনের সাথে সত্যেন্দ্রনাথ বোস কিভাবে জড়িত?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ ইদানিংকালে খবরের কাগজে-টাগজে লেখালেখি হচ্ছে। হয়ত আপনারা সমীক্ষণেও লিখে থাকতে পারেন। এই আলোচনাটা আমার মতে, আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে ছেলে মানুষি। তার কারণ, আমাদের যতরকম মৌলিক কণা আছে, তাদেরকে আমরা দুইরকমভাবে ভাগ করতে পারি। একদল মৌলিক কণা হচ্ছে **ফার্মিয়ন**, আর এক দল **বোসন**। যদি একসাথে অনেকগুলো ফার্মিয়ন থাকে তাহলে তাদের যে আচরণ, যে প্রোপারটি; একসঙ্গে অনেকগুলো বোসন থাকলে তার প্রোপারটি আলাদা। এই বিভাগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন, আমাদের সাধারণ জীবনে নতুন কারো একটা বাচ্চা হল। তখন প্রথম প্রশ্ন, ছেলে হল না মেয়ে হল? ফার্মিয়ন ও বোসন হচ্ছে ঠিক এই ধরনের একটা প্রশ্ন। এবং বোসনের প্রোপারটি নিয়ে আরও অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। সুপার কন্ডাক্টিভিটি, সুপার ফ্লুইডিটি, বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেশন এবং এইসব কাজের জন্য অনেকে নোবেল পেয়েছেন। এই যে ফার্মিয়ন ও বোসন, তাদের মধ্যে যে তফাৎ – **বোস স্ট্যাটিসটিক্স**, আমাদের অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস সেই কাজ করেছিলেন। সেই কাজের স্ট্যান্ডার্ড অনেক উপরে। এখন হিগস-বোসনে হিগসের নামটা বেশি করে আসছে – এটা থেকে কোন মতেই বলা যায় না এটাতে বোসকে কোনভাবে ছোট করা হচ্ছে।

সমীক্ষণ ঃ হিগস বোসন আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে বহু দিন ধরে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আগে সফল হননি কেন?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ আমরা আগে পারিনি তার কারণ, একটা কণা তৈরী করতে যে এনার্জি লাগে তা আইনস্টাইনের সূত্র অনুসারে **[$E = mc^2$]**। এখন আমরা জানি হিগস-বোসনের ভর কত। প্রোটনের প্রায় একশ ত্রিশ গুণ। ওরকম ভারী একটা জিনিসকে তৈরী করবার মত এনার্জির যন্ত্র আমাদের ছিল না। কিন্তু চেষ্টা বহু দিন ধরে চলছিলো।

সমীক্ষণ ঃ যখন হিগস বোসন আবিষ্কার হল, বিভিন্ন সংবাদপত্র খরবটা এভাবে দিল যে, ঈশ্বর কণার আবিষ্কার হয়েছে। হিগস বোসনকে কি 'ঈশ্বর কণা' বলা যায়?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এ বিষয় নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। যারা চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন, লেওন লেডারম্যান। তিনিও নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অন্য কাজের জন্য। তিনি হতাশার বশে এই কণাটার নাম দিয়েছিলেন – 'ঈশ্বর কণা'। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে যে ঈশ্বরকে আমরা ভাবি, তার সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এটা একটা নাম মাত্র। কিন্তু যখন এটা আবিষ্কার হল, তখন ঐ নামটার উপর ফোকাসটা এত বেশি পড়ে গেল যে, মানুষের একটা ভুল ধারণা হল – এর সাথে বুঝি সত্যিই আমরা যাকে ভগবান বলে মনে করি তার কোনও সম্পর্ক আছে!

একটা সহজ এনালজি দিলে সাধারণকে জিনিসটা বোঝাতে সুবিধা হবে। বিদ্যাসাগরের নাম তো ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি খুব শ্রদ্ধেয় লোক, আমরা তা জানি। কিন্তু ঈশ্বর নন। ঈশ্বর সাথে চন্দ্র কথাটা যে রয়েছে, তার মানেই কিন্তু তিনি ঈশ্বর নন। 'ঈশ্বর কণা'টা হচ্ছে সেরকম। এটার নাম হচ্ছে 'ঈশ্বর কণা'। তার সাথে সৃষ্টিকর্তাকে জড়ানোটা ঠিক নয়।

সমীক্ষণ ঃ আচ্ছা, লেডারম্যান বইটার যে নাম দিয়েছিলেন, সেটাকে উনি গড পার্টিকল (God Particle) বলেছিলেন, না গড-ড্যাম পার্টিকল (God-damn Particle) বলেছিলেন?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ বইটা যখন ছাপা হয় তখন তার নাম গড পার্টিকল থাকে। গড পার্টিকল শুধু নয়, তার সাথে আরও ছিলো, If the Universe Is The Answer What Is The Question – এটা ছিলো ওই বইটার শিরোনাম। উনি যখন বইটা প্রথমে পাবলিশারের কাছে পাঠান তখন উনি 'গড-ড্যাম পার্টিকল' লিখেছিলেন। পাবলিশার ওটা পাল্টে 'গড পার্টিকল' লিখেছেন।

সমীক্ষণ ঃ এই কণাটা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর তত্ত্ব যেটা রয়েছে – মানুষের মনে বা আমাদের সমাজে – সেই ঈশ্বর তত্ত্বটা কি আরও মজবুত হচ্ছে না নাকচ হচ্ছে?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ ঈশ্বর তত্ত্বের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নাই। এটা নাম মাত্র। ঈশ্বর তত্ত্ব বলতে আপনি নিশ্চই সৃষ্টিকর্তার কথা বলছেন। ঈশ্বর কণা নামটা থাকার জন্য এর সাথে সেটাকে জড়ানো একদম ভুল হবে। যেরকম আমি বললাম – ঈশ্বর চন্দ্রের সাথে তো ঈশ্বরকে আমরা জড়াচ্ছি না। একদম এরকমই।

সমীক্ষণ ঃ পিটার হিগস শুনেছি নাস্তিক ছিলেন। সে যাই হোক। হিগস-বোসন যখন গড পার্টিকল নামে বেরিয়ে এলো, তখন বিজ্ঞানী মহলে এর প্রতিক্রিয়া কী ছিলো? এই নামটা নিয়ে কি কোন প্রতিবাদ হয়নি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এটা আপনি ঠিক বলেছেন, প্রতিবাদ হয়নি। এটা যখন আবিষ্কার হয়েছে বলে দাবী করা হল, যারা এই সাবজেক্টের সাথে যুক্ত – তারা তখন এই নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিজ্ঞানীরা তখন কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে ও বিষয় মাথা ঘামান নি, ওটা যে 'ঈশ্বর কণা' বলে মিডিয়াতে পাবলিকের কাছে ভুলভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, সেদিকে তারা তখন ফোকাস করেননি।

সমীক্ষণ ঃ এই প্রসঙ্গে জানতে ইচ্ছে করছে, একজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বলুন, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পাবলিক রিলেশনের কতটা প্রয়োজন আছে?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ আসলে একটা ব্যাপার কি – আমার মনে হয় বৈজ্ঞানিকরা পাবলিক রিলেশনের ব্যাপারটা সবসময় মাথায় রাখেন না। কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আলটিমেটলি দেখুন – আমাদের প্রত্যেকের যে গবেষণা – সে গবেষণার টাকা তো সাধারণ মানুষের টাকা থেকেই আসছে। কাজেই এটাও তো একটা দায়িত্ব যে আমরা যে কাজ করছি, সবসময় তা তাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা। যারা এই সাবজেক্টের নন বা বৈজ্ঞানিক নন তাদের সেটা বোঝানো; জটিল বিষয়টাকে যতটা সহজ করে বলা যায়। তবে ভুল ভ্রান্তি না করে। কাজেই যখন 'ঈশ্বর কণা' হিসেবে লেখালেখি হচ্ছিল, খবরের কাগজে 'ঈশ্বর কণা' বলে বেড়িয়েছিলো তখন সেটা নিয়ে আমি বলব, বৈজ্ঞানিকরা হয়তো বিস্ময়ে অভিভুত (অ্যামিউজড) হয়েছিলেন, কিন্তু তারা যে সেটাকে চ্যালেঞ্জ করবেন বা প্রতিবাদ করবেন – তারা সেটা করেননি। সেটা করা উচিত ছিলো।

"যখন 'ঈশ্বর কণা' হিসেবে লেখালেখি হচ্ছিল, খবরের কাগজে 'ঈশ্বর কণা' বলে বেড়িয়েছিলো তখন সেটা নিয়ে আমি বলব, বৈজ্ঞানিকরা হয়তো বিস্ময়ে অভিভুত (অ্যামিউজড) হয়েছিলেন, কিন্তু তারা যে সেটাকে চ্যালেঞ্জ করবেন বা প্রতিবাদ করবেন – তারা সেটা করেননি। সেটা করা উচিত ছিলো।"

সমীক্ষণ ঃ 'বিগ ব্যাং' তত্ত্বের সঙ্গে এই হিগস বোসনের কোনও সম্পর্ক আছে?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ 'বিগ ব্যাং' তত্ত্বের সাথে সম্পর্ক আছে, একটু ইনডাইরেক্টলি। এটা বলতে গেলে জিনিসটার আর একটুখানি ভিতরে ঢুকতে হয়। আমি মৌলিক কণার যে থিয়োরির কথা বললাম অর্থাৎ SM, সেটার মধ্যে হিগস-বোসনের ভূমিকাই কেন্দ্রীয়। SM হিগস-বোসন ছাড়া দাঁড়াবে না। কাজেই হিগস-বোসন না পেলে SMটা নিয়েই হয়ত আমাদের আবার চিন্তা করতে হত – অন্য কোনও মডেলের জন্য।

বিগ ব্যাং থিয়োরিটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্স (মহাবিশ্ব) কিভাবে তৈরী হল – তা নিয়ে। ডাইরেক্টলি সেটার সাথে হয়ত SMকে যুক্ত করা যাবে না; হিগস-বোসনকে যুক্ত করা যাবে না। কিন্তু এই যে আমরা এখন যেটা দেখছি – পৃথিবী রয়েছে, সূর্য রয়েছে, অন্য সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে – এটা হওয়ার পিছনে কিন্তু SM এবং হিগস-বোসনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ, যখন বিগ ব্যাং বিস্ফোরণ হয়, তখন তাপমাত্রা ছিলো অত্যন্ত বেশি। তারপরে ধীরে ধীরে ইউনিভার্স প্রসারিত ও ঠান্ডা হচ্ছে। তখন ইউনিভার্সের মধ্যে কোয়ার্ক, ইলেকট্রন এগুলো রয়েছে। যখন ঠান্ডা হতে আরম্ভ করল, তখন সেই কোয়ার্ক ও ইলেকট্রন পরস্পরে সাথে ইন্টার‍্যাক্ট করতে লাগল। কিভাবে সেই ইন্টার‍্যাকশনটা হচ্ছে? সেইটা হচ্ছে SM অনুসারে। SM এর নিয়ম কানুন মেনে আমরা যদি হিসাব করি তাহলে দেখতে পাব, সেই গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আমরা

এখন পৃথিবীতে যা দেখছি – কতটা হাইড্রোজেন, কতটা হিলিয়াম, সেগুলো সব মিলে যাচ্ছে। কাজেই এইভাবে বলব আমি – **SM-এ হিগস-বোসনটা হচ্ছে একটা বেসিক এনটিটি।**

বিগ ব্যাং থিয়োরি খুব ভাল – এইটা আমরা বলছি কেন? আমরা এখন ইউনিভার্সে কত হাইড্রোজেন দেখছি, কত হিলিয়াম দেখছি বিগ ব্যাং থিয়োরির প্রেডিকশন সেটা মিলিয়ে দিচ্ছে। মেলাতে পারত না, যদি হিগস-বোসন না থাকত, SM ঠিক না হত। এইভাবে ইনডাইরেক্টলি সম্পর্কযুক্ত। আপনার প্রশ্নটা ভাল, কিন্তু বোঝানোর পক্ষে একটু কঠিন।

সমীক্ষণ ঃ ৪ঠা জুলাই ২০১২, সার্নের ঘোষণানুযায়ী প্রাপ্ত কণাটা কি বিজ্ঞানীরা যে হিগস বোসনের ধারণা করেছিলন, সেই কাঙ্ক্ষিত কণা? ঠিক সেটাই?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ আপনি বলছেন ঠিক সেটাই? এটার উত্তর আমি বৈজ্ঞানিক হিসেবে 'হ্যাঁ' বলতে পারব না। এটা কি রকম জানেন? ধরুন আমি কাউকে খুঁজছি এবং তার যে বর্ণনা আমাকে দেওয়া হয়েছে, তার উচ্চতা কত, তার ওজন কত, তার চেহারা কিরকম, তার গায়ের রং কিরকম – সমস্ত কিছুই হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ইনি যে উনিই, তা জানার জন্য তার হয়ত আই ডি কার্ড, কি ভোটার আই ডি, কি তার পাশপোর্ট আমাদের দেখতে হবে। সেই ভোটার আইডি, কি পাশপোর্ট আমরা দেখতে পারিনি। কিন্তু হিগস-বোসন সম্বন্ধে যা যা বলা হয়েছে, যা যা আমরা জানি – প্রায় হুবহু সব মিলে গেছে।

সমীক্ষণ ঃ এই কারণেই কি সার্ন ঘোষণা দিয়েছে ৯৫% কনফার্ম?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ হ্যাঁ, এই কারণেই বলেছে। তা না হলে জিনিসটা ঠিক সত্যি কথা বলা হবে না।

সমীক্ষণ ঃ এই পরীক্ষার জন্য এল এইচ সি (লার্জ হ্যাডরন কোলাইডার) দরকার হল কেন?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ আমাদের **এল এইচ সি** যন্ত্রটা দরকার হয়েছিলো এই কারণে – আমি যে বলেছিলাম হিগস বোসনের মাস (ভর) খুব বেশি হওয়ায়, সেটাকে তৈরী করতে আমাদের খুব বেশি এনার্জি দরকার হচ্ছিল। সেই এনার্জির যন্ত্র আমাদের ছিলো না; পৃথিবীতেই সেরকম যন্ত্র নেই। সার্নে অনেকদিন চেষ্টা করে, অনেক টাকা খরচ করে, বিশ্বের অনেক দেশ মিলে, ভারতবর্ষও রয়েছে – এই যন্ত্রটা তৈরী করা হয়েছে। এটা মাথায় রেখেই তৈরী করা হয়েছে যে, এটার এনার্জি এমন হবে যাতে হিগস বোসন যদি থাকে, তাকে যেন ল্যাবরেটরিতে আমরা দেখতে পাই। সেইজন্য এল এইচ সি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমীক্ষণ ঃ এল এইচ সি কিভাবে কাজ করে?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এল এইচ সি কি করছে – আমাদের ঐ এনার্জি তৈরী করতে হবে প্রোটন বা এইরকম কোনও মৌলিক কণাকে খুব হাই এনার্জিতে নিয়ে গিয়ে ওরকম দুটো কণাকে কোলাইড (সংঘর্ষ) করিয়ে। এল এইচ সি ঠিক এটাই করছে। দুটো প্রোটন হাই এনার্জিতে কোলাইড করছে। কোলাইড করবার পরে তারা অনেক কিছু তৈরী করছে। তার মধ্যে হিগস-বোসনও তৈরী হচ্ছে।

সমীক্ষণ ঃ সার্নে কি বহুসংখ্যক হিগস-বোসন পাওয়া গেছে? অন্যান্য কণাও তো তৈরী হয়েছে নিশ্চই। তার মধ্য থেকে হিগস-বোসনকে চিহ্নিত করল কিভাবে?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ খবরের কাগজে এরকম বেরোচ্ছে যে সার্নে একটা হিগস-বোসন দেখা গেছে। এইভাবে লেখার মধ্যে একটা সরলীকরণ রয়েছে। সেটা ঠিক নয়। একটা হিগস বোসন নয়। সার্নে হয়ত কয়েক হাজার হিগস বোসন তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেই এক হাজার যদি তৈরী হয়ে থাকে সেই এক হাজারকে আমাদের চিহ্নিত (আইডেন্টিফাই) করা সম্ভব হয় নি। তার মধ্যে হয়ত কয়েকশকে আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। একটা নয়, বেশ অনেক হিগস বোসন পাওয়ার পরই এই ঘোষণা করা হয়েছে।

এবার আপনার প্রশ্নের আর একটা পার্ট যেটা এল এইচ সি'তে দুটো প্রোটনের ধাক্কায় হিগস বোসন ছাড়াও অনেক কিছু তৈরী হল। এখন হিগস বোসনটাকে আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব? তার জন্য এল এইচ সি ছাড়াও ডিটেক্টর বলে আর এক ধরনের যন্ত্র লাগে। হিগস বোসন খোঁজার জন্য দুটো ডিটেক্টর সার্নে ব্যবহার করা হয়েছে। একটা হল CMS, অন্যটি ATLAS। CMS এ ভারতবর্ষের অনেক বৈজ্ঞানিক যুক্ত।

সমীক্ষণ ঃ দেখা গেছে সার্নের এই ডিটেক্টর যন্ত্রগুলি খুবই জটিল ও বৃহদাকার। সেটা কেন?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ ডিটেক্টর যন্ত্রগুলি ব্যবহার করে পরীক্ষার ফলাফল বলা যায় যে, কী কণা তৈরী হল। সেটা কি প্রোটন না নিউট্রন, নাকি ইলেকট্রন, না আরও যেসব মৌলিক কণা আছে সেগুলো। একটা বড় মুশকিল হচ্ছে – হিগস বোসনের খুব অল্প সময়ের জন্য অস্তিত্ব থাকে। মুহূর্তের মধ্যে হিগস বোসন অন্য কণায় ডিকে (decay) করে যাবে। তাই হিগস বোসন থেকে অন্য যেসব কণা তেরী হল সেগুলোকে খুঁজে বার করে তার থেকে ইনডাইরেক্টলি, যে হিগস বোসন

এসেছে সেইটা বার করতে হবে। তার জন্যই CMS এবং ATLAS। এক্সপেরিমেন্টগুলো খুব জটিল এবং এক একটা যন্ত্রের সাইজ হচ্ছে – পাঁচতলা/ছয়তলা বাড়ির মত। হয়তো কয়েক হাজার বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ার এক একটা এক্সপেরিমেন্টের সাথে যুক্ত। যে সমস্ত রেজাল্ট তারা পাচ্ছেন – সেগুলি তক্ষুণি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং সবাই মিলে কাজ করছে, হিগস বোসন খুঁজতে। তাই এল এইচ সি, CMS ও ATLAS ডিটেক্টর, সমস্ত বৈজ্ঞানিক; এর কোনটাকে বাদ দিলে হত না।

সমীক্ষণ ঃ স্যার, একটা জিনিস বলুন। এই সমগ্র ব্যাপারটার সঙ্গে এই ডিপার্টমেন্ট কিভাবে যুক্ত?

অধ্যাপক চৌধুরী ঃ আগে আমি আর একটু বড় ফ্রেমে বলি যে, ভারতবর্ষ কিভাবে যুক্ত। এই এল এইচ সি-র মধ্যে যেসব যন্ত্রাংশ লেগেছে, এই যেমন ম্যাগনেট ইত্যাদি; সেগুলির অনেককিছুই ভারতবর্ষে বানানো হয়েছে। ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টার বম্বেতে, কিংবা ইন্দোরে রাজ-রামান্নাথ সেন্টার সেগুলো বানিয়েছে। CMS যন্ত্রে কাজ করছেন ভারতবর্ষ থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক। যেমন – আমাদের কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স আছে, বম্বেতে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ আছে এবং তাঁরাও নানারকম যন্ত্রপাতি বানিয়েছে। যখন পরীক্ষা হয় তখন সার্নে গিয়ে তাঁরা সেখানে থেকেছেন এবং তারপর সেই পরীক্ষার ফলকে এনালাইজ করে দেখেছেন যে, এর মধ্যে সত্যি হিগস বোসন আছে কিনা? এঁরা এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাসপেক্টটা দেখেছেন হিগস বোসনের।

আমাদের ডিপার্টমেন্টে এই এক্সপেরিমেন্টের সাথে সরাসরি যুক্ত কেউ নেই। কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্ট যারা করছেন, হিগস বোসন আছে কিনা, পাওয়া গেল কিনা – এটা যখন তারা খুঁজছেন, তাদের গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে কিছু থিয়োরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন; তারা অংক কষে বলছেন – যদি হিগস বোসন তৈরী হয় তাহলে কিন্তু তোমরা এই ধরনের জিনিস দেখতে পাবে। ঐ ধরনের জিনিস দেখলে কিন্তু, হিগস বোসন নয়। এই থিয়োরিটিক্যাল ক্যালকুলেশনগুলো অন্য লোকেরা করছেন। তার মধ্যে এই ডিপার্টমেন্টের একাধিক বৈজ্ঞানিকও রয়েছেন। এই ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা হিগস বোসনের উপর পি এইচ ডি থিসিস লিখেছেন। তারপর রিভিউ লিখেছেন। এসব রিভিউ খুব নাম করেছে। কাজেই হিগস বোসন নিয়ে অনেকেই কাজ করছেন।

সমীক্ষণ ঃ সার্নে যে গবেষণা হচ্ছে, সেই গবেষণা কি সার্ন ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও হচ্ছে?

> “ভরকে মৌলিক হিসেবে দেখবেন কিনা, এটা নির্ভর করছে কী পরীক্ষার জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারি – ভর একটা মৌলিক জিনিস। কিন্তু কণা পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগুলো হাই এনার্জি স্কেলে হয়। যত হাই এনার্জিতে সেই পরীক্ষা হয়, তখন সেই এনার্জিতে এই প্রশ্নটা আসে, SM-এ এই প্রশ্নটা উঠেছে যে, ভর মৌলিক নয়, ভর একটা অন্য কোনও প্রসেস থেকে তৈরী হচ্ছে।”

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এই গবেষণা তো সারা পৃথিবীতেই হচ্ছে। ভারতবর্ষেও হচ্ছে। তবে অ্যাকচুয়াল পরীক্ষাটা করতে বা হিগস বোসন তৈরী করতে যে শক্তি লাগে সেই শক্তির যন্ত্র সারা বিশ্বে আর কোথাও নেই। এর আগে সর্বোচ্চ শক্তির যন্ত্র ছিলো আমেরিকার একটি যন্ত্র ট্রেভারট্রন। কিন্তু সেই যন্ত্রের শক্তিও যতটা দরকার ততটা ছিলো না।

সমীক্ষণ ঃ আমরা ছোট সময় পড়েছি – বস্তুর ভর মৌলিক ধর্ম। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন – কণা এই ভরটা অর্জন করে। তাহলে কি বস্তুর ভরকে আমরা মৌলিক ধর্ম হিসেবে দেখব না?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এটা ভাল প্রশ্ন। এখন, মৌলিক ধর্ম জিনিসটা কিছুটা আপনার পরীক্ষার উপরে নির্ভর করে। যেমন ধরুন, কেমিস্ট্রির কাজ যেসব হয়, তাতে মলিকিউলকে (অনু) মৌলিক ধরলে কোনও অসুবিধা নেই। বড়জোড় এটমকে (পরমাণু) মৌলিক ধরা যায়। এটমের মধ্যে যে আরও অন্য কোনও কিছু রয়েছে এটা জানার দরকার নেই। কেমিস্ট্রির পক্ষে এটম এবং মলিকিউল মৌলিক। বায়োলজির পক্ষে তো ডেফিনিটলি মৌলিক হচ্ছে – মলিকিউল। মলিকিউল নিয়েই বায়োলজির কাজ হয়। কাজেই ভরকে মৌলিক হিসেবে

দেখবেন কিনা, এটা নির্ভর করছে কী পরীক্ষার জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা বলতে পারি – ভর একটা মৌলিক জিনিস। কিন্তু কণা পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগুলো হাই এনার্জি স্কেলে হয়। যত হাই এনার্জিতে সেই পরীক্ষা হয়, তখন সেই এনার্জিতে এই প্রশ্নটা আসে, SM-এ এই প্রশ্নটা উঠেছে যে, ভর মৌলিক নয়, ভর একটা অন্য কোনও প্রসেস থেকে তৈরী হচ্ছে। কাজেই আপনার প্রশ্নটার উত্তর আলাদা আলাদা লেভেলে আলাদা আলাদা রকম।

সমীক্ষণ ঃ কণা কিভাবে ভর অর্জন করে? হিগস মেকানিজম কি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এটার একটা এনালজি দিলে হয়ত সুবিধে হবে। কলকাতার একটা এনালজি দিচ্ছি। আমি এখান থেকে মানে রাজাবাজার থেকে হেঁটে মনে করুন শিয়ালদহ যাব। আমার একটা নির্দিষ্ট গতি থাকবে এবং সেটা আমার ভরের উপর নির্ভর করবে; আরও অনেক ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করবে। এবং মনে করুন প্রচন্ড বৃষ্টি হল। রাস্তা জলমগ্ন হল। এখন আমার শিয়ালদহ যেতে হলে ঐ জল ঠেলে যেতে হবে। তার ফলে আমার যাওয়া বিঘ্নিত হল, অনেক অসুবিধে হল। এবং আমাদের মনে রাখতে হবে, ভর কিন্তু একটা ইনারসিয়া (জাড্যতা)। আপনি যে মুভ করছেন, সেই মুভ করার সময় যে বাধাটা পাচ্ছেন, সেটাই হচ্ছে ভর। কাজেই আমি খালি রাস্তায় যেভাবে সহজে হেঁটে যেত পারব, জমা জল ঠেলে যেতে আমার কিন্তু অনেক বেশি অসুবিধা হবে। হিগস মেকানিজমের আইডিয়াটা ঠিক এরকমই।

হিগস মেকানিজম যেটা বলছে সেটা আমরা যে সাধারণ চিন্তা করি সেই চিন্তা থেকে একদমই আলাদা। যে জিনিসটাকে আমরা ভ্যাকুয়াম (শূণ্য) মনে করি অর্থাৎ যেখানে কিছু নেই; সে ব্যাপারে হিগস অন্য কিছু বলছেন। হিগস বলছেন – ভ্যাকুয়াম কিছু নেই, ভ্যাকুয়ামের মধ্যে হিগস ফিল্ড বলে একটা জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে। যখন কোনও কণা হিগস ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন সেই হিগস ফিল্ডকে ঠেলে যাচ্ছে। যেমন আমি এখান থেকে শিয়ালদহ জমা জল ঠেলে যাওয়ার কথা বললাম। এবং সেই ঠেলে যাওয়ার ফলে তাদের একটা ভর আমরা দেখতে পাচ্ছি। এইটা হচ্ছে তার এনালজি। হিগস বলছেন – এই যে জল জমার এনালজিটা আমি দিলাম; জল জমা থাকলে তার উপরে যেরকম ঢেউ হয়, হিগস বোসন সেকরম, হিগস ফিল্ড সেই ভ্যাকুয়াম ভ'রে আছে তার উপর সেই ঢেউটাই হচ্ছে হিগস বোসন।

কাজেই উনি দাবী করলেন – তোমরা বুঝতে পারছ না, সারা ভ্যাকুয়াম হিগস ফিল্ডে ভর্তি। কিন্তু ঐ ঢেউটা যখন হবে, ঢেউটা যখন দেখতে পাবে তখন বুঝবে। মনে করুন আমরা সমুদ্রের মধ্যেই থাকি। একটা মাছ কি করে বোঝে সে জলের মধ্যে আছে? সে বোঝে তার ঢেউটা দেখে। হিগসের বক্তব্য হচ্ছে ঠিক তাই যে, আমরা সবাই হিগস ফিল্ডের মধ্যে রয়েছি, ডুবেই রয়েছি সেটা এমনি বুঝতে পারছি না। কিন্তু যখন হিগস ফিল্ডের মধ্যে একটা ঢেউ উঠবে, হিগস বোসন তখন বুঝতে পারব। আর আমাদের ভরটা তৈরী হচ্ছে, যেহেতু আমরা হিগস ফিল্ডের মধ্যে যাতায়াত করছি।

সমীক্ষণ ঃ কোয়ার্ক কি? কণাবিদ্যার ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত কোয়ার্ক, ইলেকট্রন – এরাই কি মৌলিকতম কণা?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ যখন আমরা মৌলিক কণা পরীক্ষা করার চেষ্টা করি, সবসময়ে দেখার চেষ্টা করি – যে কণাটাকে এখন আমাদের মৌলিক বলে মনে হচ্ছে, সেটা যদি কোনভাবে কখনও কোনও probe particle দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি তাতে কোনও টুকরো বা constituents আছে কিনা। এবং সেটা কি আমরা আবিষ্কার করতে পারি? যেমন ধরুন রাদারফোর্ড অনেকদিন আগে দেখিয়েছিলেন যে, এটমের মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে Void অর্থাৎ সেখানে কিছু নেই। একটা নিউক্লিয়াস আর তার থেকে অনেক দূরে ইলেকট্রন। এই পরীক্ষাটাই আরও টেকনিকাল সফিসটিকেশন যত বেড়েছে, আমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তিতে পরীক্ষা করেছি তাতে দেখেছি যে, নিউক্লিয়াস প্রোটন নিউট্রন মিলে গঠিত হয়েছে। আবার প্রোটন ও নিউট্রন যেটা থেকে তৈরী হয়েছে সেটা হল – কোয়ার্ক।

এখন পর্যন্ত আমরা কোনও পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি যে, কোয়ার্কের ভিতরে, আরও গভীরে আরও কোন কণা আছে কিনা। সেই জন্য আমরা মনে করছি – এখনও পর্যন্ত যতদূর আমরা বের করতে পেরেছি – সব থেকে মৌলিক কণা হল – কোয়ার্ক। একইভাবে ইলেকট্রনের ভিতরেও কোনও স্ট্রাকচার পাওয়া যায়নি। তাই ইলেকট্রনও মৌলিক কণা।

সমীক্ষণ ঃ কোয়ার্ক বললেই সাথে যে নামটা স্বাভাবিকভাবে মনে আসে – গ্লুওন। গ্লুওন কি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ গ্লুওন হচ্ছে – যেমন ধরুন প্রোটনগুলোর সব হচ্ছে পজিটিভ চার্জ। তাই দুটো পজিটিভ চার্জ একসাথে থাকতে পারবে না। বিকর্ষণের জন্য সেগুলো দূরে সরে যাবে। কিন্তু আমরা জানি যে, এটমের যে নিউক্লিয়াস তার মধ্যে অনেকগুলো প্রোটন একসাথে রয়েছে, নিউট্রনও

রয়েছে। তাহলে কথা হচ্ছে প্রোটনদের মধ্যে যে বিকর্ষণ বল সেটা কিভাবে ওভারকাম করে? নিশ্চয়ই আরও কোনও জোরালো আকর্ষণ বলের জন্যই নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রোটনগুলো একসাথে থাকতে পারে। এটা হচ্ছে **স্ট্রং ফোর্স**। এর পেছনে রয়েছে **গ্লুওন**। আমরা এখন জানি যে, যেকোন বল আসলে কোনও একসচেইঞ্জড কণার আদান প্রদানের জন্য তৈরী হচ্ছে। যেমন ধরুন, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম, যার সাথে আমরা খুব পরিচিত। সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম আসলে তৈরী হচ্ছে একটা জায়গার একটা কণা থেকে একটা ফোটন বেরিয়ে আর একটা কণায় গিয়ে ধাক্কা মারছে। যেমন আমার হাতে যদি একটা ইলেকট্রন থাকে আর আমি যদি সেটাকে উল্লম্বভাবে নাড়াই, তাহলে ঘরের অন্য কোণের কোনও ইলেকট্রন বুঝতে পারবে যে, আমি এখানে একটা ইলেকট্রন সরাচ্ছি। তার কারণ, এখানে থেকে একটা ফোটন গিয়ে ওখানে পৌঁছোচ্ছে। **ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমে যেমন ফোটন, স্ট্রং ফোর্সের জন্য সেরকম হচ্ছে গ্লুওন। গ্লুওনের মাধ্যমে এই ফোর্স একটা কণা থেকে আরেকটা কণাতে যাচ্ছে।**

সমীক্ষণ ঃ গ্লুওনের সাথে কোয়ার্কের কিভাবে ইন্টার‍্যাকশন হয়?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ কোয়ার্ক-গ্লুওনের এই ইন্টার‍্যাকশনটা যে থিয়োরি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, সেই থিয়োরি হচ্ছে – SM। এই থিয়োরিতে সিমেট্রির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সিমেট্রি হচ্ছে একধরণের ম্যাথামেটিকাল আইডিয়া (গাণিতিক ধারণা)। সেই সিমেট্রি ব্যবহার করে প্রথমে দেখা গেল যে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম ঠিক যে ধরনের নিয়ম কানুন মেনে চলে, স্ট্রং ইন্টার‍্যাকশনকেও আমরা ঠিক একই ছাঁচে ঢেলে ফেলতে পারব, যদি আমরা এই গ্লুওনের আইডিয়াটা তার মধ্যে দিই, এবং আমরা যদি বলি একটা ফোটন একটা ইলেকট্রিক চার্জের সাথে যেরকমভাবে যুক্ত করে, গ্লুওন কোয়ার্কের সাথে ঠিক সেইভাবে যুক্ত থাকে। কিন্তু অনেক বেশি মাত্রায়; সেই জন্য অনেক বেশি শক্তিশালী।

সমীক্ষণ ঃ কোয়ার্ক-গ্লুওনের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ কথাটির কী মানে, সংজ্ঞা কী? এটা ভাবতে হবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ মানে আমরা জানি এগুলো রয়েছে। কেউ যদি আমাকে বলে এখানে একটা কোয়ার্ক আমাকে দেখাও, যেমনভাবে মাইক্রোস্কোপে একটা ইলেকট্রন দেখানো যেতে পারে। তাতে আমি কখনোই একটা কোয়ার্ককে দেখাতে পারব না বা গ্লুওনকে কখনোই আলাদাভাবে দেখাতে পারব না। এটা SM-এরই একটা অংশ।

একটা অ্যানালজি দিলে সুবিধে হবে। যেমন আমরা ইলেকট্রিক চার্জ আলাদা করে দেখাতে পারি, যেমন ইলেকট্রন, প্রোটন এগুলোর সব চার্জ আছে – আমরা এটা জানি। কিন্তু আপনি মনে করুন একটা চুম্বকে সবসময়ই একটা দক্ষিণ মেরু ও একটা উত্তর মেরু আছে। আপনি কখনও একটা দক্ষিণ মেরু বা উত্তর মেরু আলাদা করে দেখাতে পারবেন? পারবেন না। এই ব্যাপারটা স্ট্রং ইন্টার‍্যাকশনের থিয়োরিতে দেখিয়েছে যে, দুটো কোয়ার্ক একসাথে গ্লুওনের মাধ্যমে আটকে রয়েছে; কখনোই একটা কোয়ার্ককে আরেকটা কোয়ার্ক থেকে আলাদা করা যাবে না। SM-এর একটা অংশ হিসেবে যারা এটা দেখিয়েছিলেন তাদের Ph.d. থিসিসে, পরে প্রমাণিত হলে তারা নোবেল পুরস্কার পান।

তাহলে আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, আমি **যেমন একটা চুম্বকের দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরু আলাদা করে দেখাতে পারব না, সেই রকম কোয়ার্ক বা গ্লুওন দেখাতে পারব না। কিন্তু দক্ষিণ মেরু ও উত্তর মেরুর অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের কারুর কোনও সন্দেহ নেই, সেইরকম কোয়ার্ক ও গ্লুওনের অস্তিত্ব নিয়েও আমাদের কোনও সন্দেহ নেই।**

সমীক্ষণ ঃ কোয়ার্ক, গ্লুওনগুলো কখন মুক্ত বা স্বাধীন অবস্থায় ছিলো?

অধ্যাপক চৌধুরী ঃ আপনি বলছেন স্বাধীনভাবে; স্বাধীনভাবে কোয়ার্ক, গ্লুওন কখনোই পাওয়া যায়নি। কিন্তু তারা যে আছে সেই প্রমাণটা, যেমন রাদারফোর্ড প্রমাণ করেছিলেন যে, এটমের মধ্যে একটা স্ট্রাকচার আছে, সেরকমভাবে কোয়ার্ক ও গ্লুওন দিয়ে যে প্রোটন অথবা নিউট্রন তৈরী হচ্ছে সেই আইডিয়াটা প্রমাণিত হয়েছিলো খুব সম্ভবত সত্তরের দশকে।

সমীক্ষণ ঃ সৃষ্টিলগ্নে অর্থাৎ বিগ ব্যাং-এর ঠিক পরমুহূর্তে কী হয়েছিল?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ ওই সময় ওগুলো ছিল মুক্ত কোয়ার্ক ও গ্লুওন হিসেবে, কিন্তু একটা স্ট্রং ইন্টার‍্যাকশনের মাধ্যমে। যেমন, কোয়ার্ক একটা প্লাজমা ফর্মে [কসমিক স্যুপ] ছিলো। তখন তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি ছিলো।

সমীক্ষণ ঃ প্লাজমাটা তাত্ত্বিকভাবে গ্যাসীয় [আইডিয়াল] অবস্থায় না তরল অবস্থায় থাকতে হয়?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ তরল অবস্থায় থাকতে পারে না,

গ্যাসীয় অবস্থাতেই থাকতে পারে।

সমীক্ষণ ঃ কিন্তু আর RHIC [রিলেটিভিস্টিক হেভি আয়ন কোলাইডার] ও অন্যান্য পরীক্ষায় এদের চলন-বলন, বিশেষত্ব তরলের মত, বিশুদ্ধতম তরলের মত দেখা গেছে। এর কারণ কি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এটার সাথে যেটা তুলনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ফেজ ট্রান্জিশন (phase transition)। এখন পর্যন্ত কোন পরীক্ষার যার মধ্যে RHICও রয়েছে, যতটা প্রমাণ পেলে আমরা খুশি হব, জোর গলায় বলতে পারব, সেরকম প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

সমীক্ষণ ঃ ফেজ ট্রানজিশন কি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ জল যখন ফোটে, ফুটে বাষ্প হয়ে যায় – এই যে চেঞ্জ, যে একটা লীনতাপের মাধ্যমে জলটা হয়ে যাচ্ছে বাষ্প – সেটাকে বলা হয় ফেজ ট্রানজিশন। তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না। একই তাপমাত্রায় জলও রয়েছে, বাষ্পও রয়েছে। ১০০°সে. তাপমাত্রায় এই 'চেঞ্জ অফ ফেজ'টা হচ্ছে। কণা পদার্থবিদ্যায় যে ফেজ ট্রানজিশনের কথা বলছি বা ভাবছি, সেটা হচ্ছে কোয়ার্ক-গ্লুওন একটা ফেজ; আর একটা ফেজ হচ্ছে প্রোটন-নিউট্রন। কোয়ার্কীয় প্লাজমা থেকে যখন প্রোটন নিউট্রনে রূপান্তরিত হচ্ছে, সেখানে কোয়ার্ক গ্লুওনকে আর আলাদা করে দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের ধারণা কোন একটা উচ্চ তাপমাত্রায় ওই ফেজ ট্রানজিশনটা হয়েছিলো, যেটা আমরা আবার ল্যাবে তৈরী করা চেষ্টা করছি।

সমীক্ষণ ঃ কোয়ান্টাম ক্রোমোডায়নামিক্স (QCD) বিষয়টা কি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ স্ট্রং ইন্টার‍্যাকশনের প্রসঙ্গে আমি আগে একবার বললাম যে, কোয়ার্ক এবং গ্লুওন কিভাবে ইন্টার‍্যাকশন করছে। সেটা তৈরী করা হয়েছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম ছাঁচে, একই মডেলে। কিন্তু এটা আরও অনেক জোরালো ইন্টার‍্যাকশন। সেটারই নাম হচ্ছে কিউ সি ডি।

সমীক্ষণ ঃ অ্যাসিম্পটোটিক ফ্রিডম (asymptotic freedom) কি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এটা হচ্ছে QCD-র একটা প্রোপারটি যেটার কথা আমি আপনাকে বললাম যে, কখনও আমরা একটা কোয়ার্ক আলাদা করতে পারব না আরেকটা অ্যান্টি কোয়ার্ক থেকে, যেমন একটা চুম্বক থেকে তার উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরুকে আলাদা করা যাবে না। এটাই হচ্ছে অ্যাসিম্পটোটিক ফ্রিডম তত্ত্ব।

সমীক্ষণ ঃ যখন কোয়ার্কগুলি কাছাকাছি আসে তখন তাদের মধ্যে ইন্টার‍্যাকশন ফোর্স কমে যায়, এটা কি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এটাই হচ্ছে অ্যাসিম্পটোটিক ফ্রিডম। এর দুটো দিক আছে। কোয়ার্কগুলি যত কাছাকাছি আনা হবে, তত তাদের মধ্যে ইন্টার‍্যাকটিভ ফোর্স কমে যাবে। আমি যখন বললাম তখন দূরে নিয়ে যাওয়ার অ্যাসপেক্টটার উপর জোড় দিয়েছি। সেহেতু দুটো কোয়ার্ককে একটা থেকে আরেকটাতে আলাদা করতে গেলে ফোর্সটা বাড়তে থাকবে, সীমাহীনভাবে বাড়তে থাকবে, সেইজন্য কখনই আমাদের পক্ষে দুটো কোয়ার্ককে আলাদা করা সম্ভব নয়। এর উল্টো ব্যাপারটা হল – যদি কোয়ার্ক দুটোকে কাছাকাছি আনা যায়, তাহলে ফোর্সটা কমতে কমতে প্রায় শূন্যে নেমে আসবে।

সমীক্ষণ ঃ সুপার ইউনিফায়েড ফিল্ড (Super unified field) কি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ আমার মনে হয় সাধারণের জন্য হিগস বোসনের আলোচনায় সুপার ইউনিফিকেশন কী, সুপার সিমেট্রি কী, এক্সট্রা ডায়মেনশন কী– এই জিনিসগুলো না বলাই ভাল। কিন্তু যখন আপনি প্রশ্নটা করলেন তখন এটুকু বলি, SMই কি শেষ কথা? না সেটা নয়। SM-এর কিছু দুর্বলতা আছে। দুর্বলতাগুলো সমাধান করবার জন্য কি করা যেতে পারে, তার জন্য বৈজ্ঞানিকরা সুপার সিমেট্রির তত্ত্বের কথা ভাবছেন। তারপরে আরেকটা দিক যেটা আইনস্টাইনও অনেকদিন সেই নিয়ে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সার্থক হননি তার কাজে, সেটা হল যে আমরা তো ভাবি যে স্পেসে তিনটি দিক x, y, z এবং সময়, সব মিলে চারটে মাত্রা (ডাইমেনশন)। কিন্তু এখন অনেকে বলছেন, হয়ত তা নয়। হয়তো আরও অনেক মাত্রা রয়েছে, আমরা সেগুলি দেখতে পাচ্ছি না। তবে হিগস বোসন নিয়ে লিখতে গেলে এগুলো না বলাই ভালো। সহজ কথায় যদি অল্প কিছু বলা যায় সেটাই ভালো।

সমীক্ষণ ঃ তাহলে আমাদের আলোচনা গুটিয়ে শেষের দিকে নিয়ে আসি। এই আবিষ্কার কি SM-এর পাশাপাশি বিগ ব্যাং তত্ত্বকেও আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করল?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এটা অবশ্যই বিগ ব্যাং তত্ত্বকে সাপোর্ট করল। কিন্তু যারা সরলীকরণের মাধ্যমে বলছেন যে এটা না হলে মহাবিশ্বই থাকত না – এরকম কথা শোনা যাচ্ছে, আমার মনে হয় সেগুলো আরও যত্ন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করার এখনও অবকাশ রয়েছে। তবে এখনকার যে বিগ ব্যাং মডেল তাতে SM-এর একটা ভূমিকা রয়েছে, যেটা আমি আগেই আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম। তবে আমার মনে হয়

না যে, বিগ ব্যাং মডেলটা হিগস বোসন আবিষ্কার না হলে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। তার থেকে SM-এর উপর চাপটা আরও বেশি হত।

সমীক্ষণ ঃ হিগস বোসনের আবিষ্কার বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কী ভূমিকা রাখলো?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ আমার মনে হয় হিগস বোসনের আবিষ্কার সরাসরি যে খুব অগ্রগতি আনবে এমন নয়।SM-টা গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষের দিকে মোটামুটি ফর্মুলেটেড হয়ে গেছিলো। সত্তর দশকে আরও বেশি ফর্মুলেটেড হয়েছে, শার্পলি ফোকাস্‌ড হয়েছে। কিন্তু হিগস বোসন তার একটা পিলার। এবং পিলারটা যতদিন পর্যন্ত না আমরা পরীক্ষা করে দেখাতে পারছি যে, সত্যিই সেটা রয়েছে, ততদিন পর্যন্ত SM যতই ভাল হোক না কেন, তার সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন থেকে গেছিলো। সেটা এখন তার উত্তর পেয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, এটা বলা উচিত হবে যে, হিগস বোসনের আবিষ্কারের জন্য অল্প দিনের মধ্যে সাংঘাতিক নতুন কিছু হয়ে গেল।

সমীক্ষণ ঃ এল এইচ সি'র মেয়াদকাল তো ২০১৭ পর্যন্ত বলা হচ্ছে। এরপর কি বিজ্ঞানীরা আরও উন্নততর (হাই লেভেল) গবেষণার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এটা নিয়ে এখন বিরাট আলোচনা চলছে – এর পরের ধাপটা কী হওয়া উচিত। অনেকে বলছেন যে, এল এইচ সি'র মধ্যেই যে টানেল রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে প্রোটন এখন চলছে, সেখানেই কোনও পরিবর্তন এনে তার মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন পাঠানো যায় কিনা। ইলেকট্রন-প্রোটন সংঘাত বা ইলেকট্রন-ইলেকট্রন সংঘাত, ইলেকট্রন-পজিট্রন সংঘাত করা যায় কিনা। কোনটা ভাল, কোনটার খরচ কত – সেই সমস্ত ইস্যুই জড়িত এটার সাথে। আর একটা দিক নিয়ে অনেকেই ভাবছে। সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লিনিয়ার কোলাইডার (আই এল সি) নামে একটি যন্ত্র। এটাতে খুব হাই এনার্জি ইলেকট্রনের সাথে ইলেকট্রনের এন্টিপার্টিকেল পজিট্রনের হাই এনার্জি সংঘর্ষ হবে। কিন্তু এগুলো এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। বিজ্ঞানী মহলে এটা নিয়ে প্রচন্ড আলোচনা চলছে। এরকম একটা যন্ত্র বানাতে গেলে অন্ততঃ দশ-পনের বছর আগে থেকে চিন্তাভাবনা শুরু করা, প্রোটোকল কি – এটা-ওটা অনেক কিছু করতে হয়।

সমীক্ষণ ঃ সার্নের এই যে গবেষণায় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন বিজ্ঞানী রয়েছেন, বিজ্ঞান কর্মীরা রয়েছেন, বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা রয়েছে; তাহলে সার্নের এই গবেষণা কি আমাদের এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আজকের দিনের গবেষণা শুধুমাত্র কতিপয় ব্যক্তির, একটা দেশের বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না? অর্থাৎ আজকের উন্নত বিজ্ঞান প্রযুক্তি কি একটা আন্তর্জাতিকতার বার্তা দিচ্ছে?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এটা ঠিকই। পার্টিক্‌ল ফিজিক্সে কোনও একটা পরীক্ষা করতে যে খরচ আর যতজন বিজ্ঞানীর প্রয়াস দরকার, তা একটা দেশের পক্ষে একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা খুব কঠিন ব্যাপার। পার্টিকল ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন এখন জরুরী হয়ে পড়ছে।

সমীক্ষণ ঃ পৃথিবী জুড়ে যে বিভিন্ন গবেষণা হচ্ছে তার তো একটা ফান্ডিং-এর প্রয়োজন। তা পার্টিকল ফিজিক্সের ক্ষেত্রে ফান্ডিং কেমন?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এই টাকাতো আসলে সাধারণ মানুষের টাকা, তাই সেই টাকা যখন ব্যয় করা হবে গবেষণার কাজে তখন এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, এই টাকা কিভাবে খরচ করলে সাধারণ মানুষের কতটা উপকার হবে। এই যেমন আপনি বলতে পারেন ফাইন আর্টসকে যে সাপোর্ট করা হয়, সেটা থেকে সাধারণ মানুষের কী উপকার হবে? একটা যেকোন জাতির জন্য এগুলো দরকার। ফাইন আর্টসও দরকার, বেসিক সায়েন্স যার হয়ত প্রত্যক্ষ প্রয়োগ নেই তবু সেগুলোও দরকার। তবে সেভাবে দেখতে গেলে পার্টিকল ফিজিক্সের এখন যে ফান্ডিং রয়েছে, তা মোটামুটি ঠিকই আছে।

আপনারা তো জানেন যে, পশ্চিমে এখন ওরা একটা অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেরোবার চেষ্টা করছে, তাই সেই অবস্থায় এর থেকে ভালো হওয়া কঠিন।

সমীক্ষণ ঃ আমরা শুনেছিলাম যে, ফার্মি ল্যাবে ট্রেভারট্রনের পরীক্ষা বন্ধ আছে। তার অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে যে, সেখানে এখন ফান্ডিং হচ্ছে না। এটা কি সত্যি?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এ ব্যাপারে দুটো ইন্টারেস্টিং গল্প বলি। ফার্মি ল্যাব তখন তৈরী করবার জন্য ফার্মি ল্যাবের পরবর্তীকালের প্রথম ডিরেক্টর আমেরিকার সেনেটে বিষয়টা পেশ করলেন – তখন **সেনেটে ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, "আপনি যে এই ল্যাবটা তৈরী করছেন তাতে আমেরিকার ডিফেন্সের (প্রতিরক্ষায়) কোন সুবিধা হবে কী?" তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "না, তাতে আমেরিকার ডিফেন্সে কোনও সুবিধা হবে না, কিন্তু *This is what makes America worth defending*"।** এটা গেল একটা গল্প। আর এগুলো আছে বলেই আমেরিকা আজকে worthmind।

দ্বিতীয় গল্প হচ্ছে এল এইচ সি-এর মত ঠিক একই রকম, আরও শক্তিশালী একটি যন্ত্র আমেরিকায় তৈরী হবার কথা ছিল। সুপার কন্ডাক্টিং সুপার কোলাইডার (এস এস সি)। সেটা অনেকটা এগিয়েও গেছিলো। কিন্তু তার খরচ বেশ বেশিই হচ্ছিল, সেটা নিয়ে যখন সেনেটে একবার আলোচনা হয়, তখন অনেক আমেরিকান বৈজ্ঞানিককে ডাকা হয় যে, কেন এই যন্ত্রটা বানানো যুক্তিযুক্ত। এত টাকা কেন খরচ হবে। তখন ওয়াইনবার্গ ও অন্যান্য নোবেল প্রাপ্ত বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। ওয়াইনবার্গকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, **"এত টাকা দিয়ে যন্ত্রটা বানালে তা দিয়ে কি আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে, ঈশ্বর কণা নয়, কিছু বলতে পারব?" তখন ওয়াইবার্গ বলেছিলেন, "না, ঈশ্বর সম্বন্ধে এটা দিয়ে কিছু বলা যাবে না।" তখন সেনেটররা বললেন, "না, তাহলে এত টাকা খরচ করবার দরকার নেই।"** গল্পটা এখানেই শেষ।

তবে বিজ্ঞানী ওয়াইনবার্গ পরে একটা বইয়ে লিখেছিলেন, "আমি নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী নই। আমি প্রমাণ করতে পারব না ঈশ্বর আছে কি নেই। তাই আমি মনে করি, যারা মনে করেন ঈশ্বর আছে – সেটা তাদের নিজস্ব ধারনা বা বিশ্বাস। কিন্তু এই যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না বলে যন্ত্রটা খারিজ হয়ে গেল, এটার জন্য আমার সারা জীবন দুঃখ রয়ে যাবে।"

সমীক্ষণ ঃ এই আবিষ্কারটা সাধারণ মানুষের জীবনে কী কল্যাণ নিয়ে আসবে?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ এখনই কল্যাণকর আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অনেক সময়, যখন ধরুন বিদ্যুতের আবিষ্কার হয়, তখন তো তার কী কল্যাণকর ফল হতে পারে তা বোঝা যায় নি। সেমিকন্ডাক্টর যখন আবিষ্কার হয়, তখন তো সেল-ফোনের কথা মাথায় ছিলো না। এখন হিগস বোসন সবে আমরা পেয়েছি ভবিষ্যতে তার কী প্রয়োগ হবে সেটা এখন বলা মুশকিল।

সমীক্ষণ ঃ সাধারণ মানুষ এইসব বিজ্ঞানের বিষয় কতটা জানে বা বোঝে বলে আপনারা বিজ্ঞানীরা মনে করেন?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ আমার মনে হয়, আজকাল জিনিসটা একটু ভালো হয়েছে। টিভি, খবরের কাগজে অপেক্ষাকৃত রিপোর্টিং ভালো হচ্ছে। আরও বেশি জানা উচিত। কিন্তু আজকাল তাও একটু সচেতনতা বাড়ছে। তবে তা যথেষ্ট নয়।

সমীক্ষণ ঃ বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়েই তো মানুষ কুসংস্কার মুক্ত হয় এবং বিজ্ঞানের সত্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যায় ও জীবনে প্রয়োগ করে।

"

বিজ্ঞানী ওয়াইনবার্গ পরে একটা বইয়ে লিখেছিলেন, "আমি নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী নই। আমি প্রমাণ করতে পারব না ঈশ্বর আছে কি নেই। তাই আমি মনে করি, যারা মনে করেন ঈশ্বর আছে – সেটা তাদের নিজস্ব ধারনা বা বিশ্বাস। কিন্তু এই যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না বলে যন্ত্রটা খারিজ হয়ে গেল, এটার জন্য আমার সারাজীবন দুঃখ রয়ে যাবে।

"

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ যদি আমাদের দেশের সাপেক্ষে বলেন, যদিও আপনাদের আগের প্রশ্নের উত্তরে বললাম যে, বিজ্ঞানের প্রচার ও আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাড়ছে, কিন্তু কুম্ভ মেলায় ওইরকম ভীড় হচ্ছে – যার মধ্যে আমি একটা কনফ্লিক্ট দেখতে পাই।

সমীক্ষণ ঃ এটা কি আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতির ফল?

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ অসঙ্গতি। আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে, আরও যাতে দৃষ্টিভঙ্গিটা বৈজ্ঞনিক হয়। যতদিন না আরও বেশি শিক্ষার প্রসার হয়। ধর্মের বিশ্বাস তো থাকবেই। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আনাটা প্রয়োজন। সেটার জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে।

সমীক্ষণ ঃ এমন জায়গা যেখানে ধর্মের বিশ্বাসে কোন বাধা নেই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পথে বাধা আছে ...।

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ সেটা যদি হয় তবে খারাপ।

সমীক্ষণ ঃ আপনার কাছে অনেক কিছু জানতে পারলাম। ভাল লাগলো। ধন্যবাদ।

অধ্যাপক রায় চৌধুরী ঃ আপনাদের সাথে কথা বলেও ভাল লাগল। ■

বিশেষ নিবন্ধ

সাব অ্যাটমিক কণা এবং হিগ্‌স বোসন – একটি পরিচয়

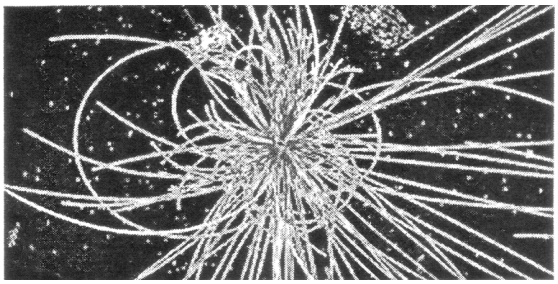

বর্তমানে বিজ্ঞানের গবেষণা যে মাত্রায় পৌঁছেছে, তার তাত্ত্বিক উপলব্ধি সাধারণের জ্ঞানের সীমার বাইরে। কিন্তু এই গবেষণাগুলিই মানব সমাজে বিদ্যমান অবৈজ্ঞানিক – কাল্পনিক মতবাদগুলির শিকড় উপড়ে ফেলেছে। তাই গবেষণাগুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যত গুরুত্বপূর্ণ, গবেষণাগুলি থেকে প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধগুলি সমাজের পক্ষে কোনও অংশেই তা থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। "হিগস বোসন" এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে, বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির "বিগ ব্যাং থিওরি" প্রমাণিত হবে, নাকচ হবে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির ঈশ্বরীয় তত্ত্ব। সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান থাকার সামাজিক কারণকে ঈশ্বর তত্ত্ব আড়াল করে অদৃষ্ট, ভাগ্য, পূর্বজন্মের ফল ইত্যাদি কাল্পনিক কারণকে হাজির করে। সুতরাং ঈশ্বর তত্ত্ব অস্তিত্ব হারালে সমাজে বিদ্যমান বৈষম্যের সামাজিক কারণ সকলের সামনে উঠে আসবে।

এই লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে বৈজ্ঞানিকদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, পারা-না পারা কর্মকান্ডের সম্মিলিত ফলাফল প্রমাণ করেছে যে বিজ্ঞানের গবেষণার সামাজিকীকরণ ঘটেছে। বর্তমান পর্যায়ের বিজ্ঞানের গবেষণা ব্যক্তি, দেশ, জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ আর নেই।

প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রজাতির সংগ্রাম মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। অজানা থেকে ভয়, ভয় থেকে ভক্তি, ভক্তি করেছে কাল্পনিক অতি প্রাকৃতিক দৈবশক্তিকে। অজানাকে যেমন ভয় পেয়েছে তেমনি আবার কেউ কেউ অজানাকে জানার চেষ্টাও করেছে। এই জানার পথেই ডারউইনের জৈব বিবর্তনের তত্ত্ব একদিকে যেমন জীবের উৎপত্তি তথা মানুষের সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করেছে, তেমনি অন্যদিকে বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির রহস্য উদঘাটন হতে চলেছে "হিগস বোসন" কণার অস্তিত্ব প্রমাণ ও তৎসংক্রান্ত আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

বর্তমানে সারা বিশ্বের পদার্থবিদদের মধ্যে সবচেয়ে চর্চিত ও সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রশ্নটি হল পদার্থের ভর অর্জনের কারণ কি? এই নিয়ে বিশ্বের প্রায় সবদেশের বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রশ্ন উঠেছে 'ভর' কি পদার্থের মৌলিক ধর্ম নয়? যদি না হয়, তবে কিভাবে পদার্থের মধ্যে ভর প্রদান হচ্ছে!

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পথে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের ক্ষুদ্রতম মৌলিক কণা বা কণাগুলির স্বীকৃতি অর্জন করেছে ভিন্ন ভিন্ন কণা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যন্ত্রপাতির উন্নতি যেমন যেমন হয়েছে মৌলিক কণাগুলির সন্ধানও তেমন তেমন পাওয়া গেছে।

খ্রী.পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতীয় দার্শনিক কণাদের 'কণা' থেকে শুরু করে, খ্রী. পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক লিউসিপ্প-এর বস্তুকণা, ডেমক্রিটাস-এর 'অ্যাটম', সপ্তদশ শতাব্দীতে বয়েল; অষ্টাদশ শতাব্দীতে চার্লস এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন ডালটন পর্যন্ত ধারণা ছিল পদার্থ অতি ক্ষুদ্র, অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত। এই কণাগুলিই হল পরমাণু বা অ্যাটম। কিন্তু তখনও অনু ও পরমাণুর পৃথক সত্ত্বা কল্পনা করতে পারা যায় নি। গেলুসাক, অ্যাভোগাড্রো, ভ্যান ডার ওয়ালসের পরীক্ষা ও গাণিতিক বিশ্লেষণ অনু ও পরমাণুর পৃথক সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৮৬৯-এ জন হিটর্ফ-এর ক্যাথড রশ্মি আবিষ্কার এবং ১৮৯৭-এ জে জে থমসন কর্তৃক ক্যাথড রশ্মির প্রকৃতি বিচার করে ঘোষণা – ক্যাথড রশ্মি প্রকৃত পক্ষে ঋণাত্মক ধর্মী, পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র আধানের স্রোত – পরমাণুর অবিভাজ্যতাকে খন্ডন করে। পরবর্তী সময়ে এই ক্যাথড রশ্মিকণার নামকরণ হয় ইলেকট্রন।

১৮৯৬ খ্রী: হেনরি বেকরেল কর্তৃক তেজস্ক্রীয় মৌলের আবিষ্কার এবং ১৯০৯-এ রাদারফোর্ডের স্বর্ণপত্র পরীক্ষা দ্বারা পরমাণুরর গঠন কাঠামোর একটা ধারণা প্রকাশ পেল – তাহল পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভরটাই কেন্দ্রস্থলে (নিউক্লিয়াস) আর ইলেকট্রনগুলি ধনাত্মক নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। এর কিছুদিন পরে রাদারফোর্ড পুনরায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ধনাত্মক কণা আবিষ্কার করে তাদের

প্রোটন নামে অভিহিত করেন। কিন্তু ইলেকট্রন ও প্রোটন দ্বারা শুধুমাত্র সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করা গেল না। বোঝা গেল সাধারণ হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য সমস্ত পদার্থের নিউক্লিয়াসে আধানহীন কোনও ভারী কণার উপস্থিতি। অবশেষে ১৯৩২ সালে জেমস চ্যাডউইক নিউক্লিয়াসের এই আধানহীন কণার আবিষ্কার করেন যার নামকরণ হয় নিউট্রন। ১৯৩২ সালে পরমাণুর গঠন কাঠামো অনুযায়ী মৌলিক কণাগুলি হল ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন।

১৯২৭ খ্রী. বিজ্ঞানী পল ডিরাক, আইনস্টাইনের স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটি'র সাপেক্ষে, ইলেকট্রন সম্পর্কিত তাঁর মূল সমীকরণের বিশ্লেষণ করে দুটি সমাধান পান, যার একটি ইলেকট্রন, অন্যটি ভরে ইলেকট্রনের সমান কিন্তু আধানে ধনাত্মক, এই নতুন কণাটির বাস্তব সন্ধান মিলল ১৯৩৩ সালে কার্ল অ্যান্ডারসনের "উইলসন ক্লাউড চেম্বার" নামক যন্ত্রে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে কাজ করার সময়। এই কণাটির নামকরণ হয় "পজিট্রন"। এটিই আবিষ্কৃত প্রথম প্রতিকণা বা অ্যান্টি পারটিকেল।

অ্যান্টিপারটিকেল কী?

কোন পার্টিকেলের, অ্যান্টি পার্টিকেলের ভর, স্পিন, স্থায়িত্ব পার্টিকেলের সমান, ভিন্নতা শুধু চার্জের প্রকৃতিতে।

এরপর ১৯৩৫ সালে জাপানি বিজ্ঞানী হিদেকি ইউকোওয়া তাত্ত্বিক গণনার মাধ্যমে এক নতুন কণার উল্লেখ করেন যার ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভর-এর মধ্যবর্তী। এর নামকরণ করা হয় "মেসন"। ১৯৩৭ সালে বিজ্ঞানী কার্ল অ্যান্ডারসন এবং তাঁর সহকর্মী নেদারমেয়ার মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে "মেসন"-এর অনুরূপ কণার সন্ধান পান। এর নাম দেওয়া হয় μ –মেসন। পাইয়ন (π -মেসন) আবিষ্কারের পরে জানা যায় মিউয়ন কণাটি মেসন কণা নয়, এটি একটি পৃথক মৌলিক কণা যা হল লেপটন।

মহাজাগতিক রশ্মি কী?

পৃথিবীর বাইরে, নক্ষত্রপুঞ্জর মধ্যে ঘটমান পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন মৌলিক কণার স্রোতই হল মহাজাগতিক রশ্মি। এই মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা ছিল গবেষকদের হাতের বাইরে, কারণ কোন নক্ষত্র থেকে, কখন, কোন কণার স্রোত পৃথিবীর কোন অংশে পৌঁছাবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। কিন্তু রাদারফোর্ড α কণার দ্বারা নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

$$^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He(\alpha) \rightarrow ^{17}_{8}O + ^{1}_{1}H$$

এই ঘটনাই ইঙ্গিত দেয় যে, উচ্চগতি সম্পন্ন কোন কণা দ্বারা কোনও অনুকে আঘাত করলে, কণা নির্গত হওয়া সম্ভব। ফলে কণা-ত্বরণ যন্ত্রের উদ্ভাবনের কথা মাথায় আসে, এবং ১৯৩১ সালে অধ্যাপক ভ্যান ভি গ্রাফ সর্বপ্রথম কণা ত্বরণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই পথেই উদ্ভব হয়, "কক্রফট ওয়ালটন কণা ত্বরণ যন্ত্র" এবং "সাইক্লোট্রন"। পাশাপাশি কণা নিরীক্ষণ যন্ত্র "বাল্‌ব চেম্বার"-এর উদ্ভাবন ঘটে।

এদিকে ১৯৩৪ সালে বিজ্ঞানী এনরিকো ফারমি, দেখাতে সক্ষম হন যে, নিউট্রন, প্রোটন রূপান্তরিত হওয়ার সময় একটি ইলেকট্রন ও আধানহীন একটি কণাও আবির্ভূত হয়। আধানহীন কণাটির নাম দেওয়া হল নিউট্রিনো।

$$n \rightarrow P^{+} + \beta^{-} + \upsilon$$

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পরমাণুর মধ্যে অবস্থিত তিনটি দীর্ঘস্থায়ী কণা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের পাশাপাশি বেশ কিছু ক্ষণস্থায়ী কণার সন্ধান পাওয়া গেল। গবেষণার স্বার্থে প্রয়োজন হল পদার্থবিদ্যার একটি নতুন শাখার, আবির্ভাব ঘটল "কণা পদার্থ বিদ্যা'র (পার্টিকেল ফিজিক্স)। পরীক্ষাগারে, ভারী পরমাণুকে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কণা দ্বারা আঘাত করে, ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪, এর মধ্যে আরো অনেক নতুন কণা যেমন মেসন, নিউট্রিনো এবং অ্যান্টি পার্টিকেলের সন্ধান পাওয়া গেল। ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের মৌলিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল। এই প্রশ্নের সমাধানে বিজ্ঞানী মারে গেলমান-এর কোয়ার্ক তত্ত্ব হাজির হয়। বিজ্ঞানী গেলমান এবং পদার্থবিদ য়ুভাল নিম্যান পারমাণবিক কণা সমূহকে গাণিতিক শ্রেণীবিন্যাসে সাজানোর চেষ্টা করেন এবং এই সজ্জা পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য গেলমান কোয়ার্ক তত্ত্ব হাজির করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে ইলেকট্রন মৌলিক কণা হলেও প্রোটন ও নিউট্রন মৌলিক কণা নয়। প্রোটন ও নিউট্রন আরো ক্ষুদ্র একপ্রকার মৌল কণা দ্বারা গঠিত। এই মৌল কণাগুলিকে বলা হয় কোয়ার্ক। ১৯৬৪ সালে আপ্ (u), ডাউন (d), এবং স্ট্রেঞ্জ (s) – এই তিনটি কোয়ার্ক আবিষ্কৃত হয়। এই কোয়ার্ক তিনটির অ্যান্টিকোয়ার্কেরও সন্ধান পাওয়া গেল। বলা হল প্রোটন (uud) এবং নিউট্রন (udd) তিনটি করে কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। যেমন তিনটি করে কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। মেসনগুলি একটি

কোয়ার্ক ও একটি অ্যান্টিকোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। যেমন π –মেসন (পাইয়ন)-এর গঠন $U\bar{d}$, K –মেসন (কাউয়ন)-এর গঠন $U\bar{S}$ । পরবর্তী সময় বটম (b), চার্ম (C) এবং টপ (t) কোয়ার্ক আবিষ্কৃত হয়। একথা জানা প্রয়োজন যে কোয়ার্কগুলিকে এখনো প্রত্যক্ষ করা যায় নি, এদের পরোক্ষ উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে।

পারমাণবিক কণাগুলির শ্রেণী বিন্যাস

প্রথমে এই শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছিল ভরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু টাউ (γ) কণা আবিষ্কারের পরে জানা গেল এর ভর প্রোটনের ভরের প্রায় দ্বিগুণ অথচ এটি একটি মৌলিক কণা – লেপটন। পরবর্তীতে দৃঢ় বলের (স্ট্রং ফোর্স) সঙ্গে ক্রিয়ার ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করা হয়। যারা দৃঢ় বলের সঙ্গে ক্রিয়া করে তাদের বলা হয় হ্যাডরন (Hadron), আর যারা তা পারে না তাদের বলা হয় লেপটন (Lepton)। যেসব হ্যাডরন তিনটি কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত তাদের বলা হয় বেরিয়ন (Baryon) এবং যেসব হ্যাডরন একটি কোয়ার্ক ও একটি অ্যান্টিকোয়ার্ক দ্বারা গঠিত তারা হল মেসন।

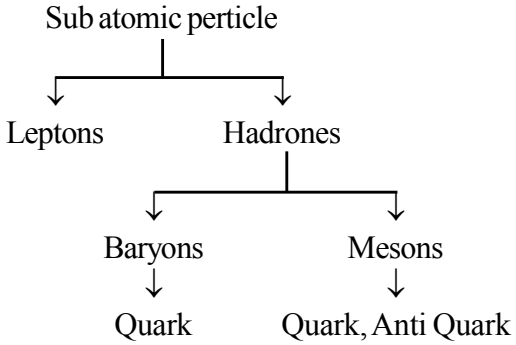

"লেপটন" হল গ্রীক শব্দ যার অর্থ হাল্কা বা দুর্বল (মৃদু)। এদের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে কিছুই অনুমান যায় না (আভাস পাওয়া যায় না)। এরা তড়িৎ চুম্বকীয় বল, মৃদু বল ও মহাকর্ষ বল দ্বারা প্রভাবিত হয়।

"হ্যাডরন" ও একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ heavy strong। এরা দৃঢ় বল দ্বারা প্রভাবিত হয়। এরা স্থান (স্পেস) দখল করে, এদের আয়তন $1fm$-এর চেয়ে সামান্য বড়। হ্যাডরনের ভিতরে কোয়ার্কগুলি এমনভাবে যুক্ত থাকে যাতে হ্যাডরনের চার্জ শূন্য (0) অথবা $\pm e$ হয়। ১৪০ ধরনের মেসন এবং ১২০ ধরনের বেরিয়ন-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। সবচেয়ে হাল্কা মেসন হল পাইয়ন। বহু মেসনের ভর প্রোটনের ভর অপেক্ষা বেশী। সবচেয়ে হাল্কা বেরিয়ন হল প্রোটন। প্রোটন-ই একমাত্র হ্যাড্রন যা মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে (স্টেবল ইন ফ্রি স্পেস)। বেরিয়নগুলি আরো সূক্ষ্ম মৌলিক কণা কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। Gell-Mann called these perticles quarks from the Phrase "three quarks for Muster Mark" that appears in James Joyce's novel Finnegan's wake.। যেহেতু প্রতিটি বেরিয়ন তিনটি কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত, তাই প্রতিটি কোয়ার্কের বেরিয়ন সংখ্যা $\frac{1}{3}$ । প্রতিটি অ্যান্টি বেরিয়ন তিনটি অ্যান্টি কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত, তাই প্রতিটি অ্যান্টি কোয়ার্কের বেরিয়ন সংখ্যা $-\frac{1}{3}$ । মেসনগুলি একটি কোয়ার্ক ও একটি অ্যান্টিকোয়ার্ক দ্বারা গঠিত হওয়ায়, মেসন-এর বেরিয়ন সংখ্যা 0 (শূন্য)। সমস্ত কোয়ার্কের স্পিন $\frac{1}{2}$, বিভিন্ন কোয়ার্কের চার্জ $\pm e$ এর ভগ্নাংশ, যা অন্য কোন কণার ক্ষেত্রে দেখা যায় নি।

"Scattering of light energy (hence short wave length) eletron by proton" – এই পরীক্ষা দ্বারা কোয়ার্কের বাস্তবতা স্বীকৃত হয়। কোয়ার্ককে লেপটন-এর মতন মৌলিক কণা বলা যায় কারণ কোয়ার্ক-এরও অভ্যন্তরীণ গঠনের আভাস পাওয়া যায় না।

এই সাব অ্যাটমিক পারটিক্লগুলি কতগুলি বল দ্বারা ক্রিয়াশীল। প্রকৃতিতে চার প্রকার মৌলিক বল বিদ্যমান। এগুলি হল –

১) **মহাকর্ষ বল** (ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশন) ঃ এই বলের গাণিতিক রূপটি নিউটন আবিষ্কার করেন। এই বলের অনুভূতি কমবেশী সকলেরই আছে।

২) **তড়িৎ চুম্বকীয় বল** (ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স) ঃ মাইকেল ফ্যারাডের পরীক্ষায় দেখা গেল তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে ওতপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান। পরবর্তী সময়ে ম্যাক্সওয়েল এই সম্পর্কের একটি রূপ দান করেন। এরও পরে কোয়ান্টাম তত্ত্বের যুগে জানা গেল এর মূলে আছে 'ফোটন' কণা।

৩) **দৃঢ় বল** (স্ট্রং ফোর্স) ঃ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক

আধান যুক্ত প্রোটনগুলির অবস্থান সত্ত্বেও নিউক্লিয়াস স্থায়ী হওয়ার কারণ অবশ্যই প্রোটোনগুলির মধ্যে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ বল অপেক্ষা জোরালো আকর্ষণ বল কাজ করছে। এই জোরালো আকর্ষণ বলটি হল দৃঢ় বল।

৪) **মৃদু বল** ঃ তেজস্ক্রীয় পদার্থ থেকে যখন β রশ্মি নির্গত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। কিন্তু নিউক্লিয়াসের মধ্যে তো ইলেকট্রন নেই। সুতরাং কোন না কোনও কণার রূপান্তরে ইলেকট্রন সৃষ্টি হচ্ছে। যে বলের জন্য এরূপ রূপান্তর ঘটছে তাকে মৃদু বল বলা হয়।

প্রত্যেক প্রকার বলের ক্ষেত্র বিদ্যমান। ধারণা করা হয় এক এক প্রকার বলক্ষেত্রে এক এক প্রকার বলকণা বিদ্যমান। এই বলকণাগুলির আদান প্রদানের মাধ্যমেই বল ক্রিয়াশীল হয়। যেমন মহাকর্ষ বলক্ষেত্রের বলকণা হল "গ্রাভিটন", তেমনি তড়িৎচুম্বকীয় বলক্ষেত্রের বলকণা "ফোটন", মৃদু বল ক্ষেত্রের বলকণা হল গেজ বোসন/ইন্টারমিডিয়েট ভেক্টর বোসন এবং দৃঢ় বলক্ষেত্রের বলকণা হল "গ্লুওন"।

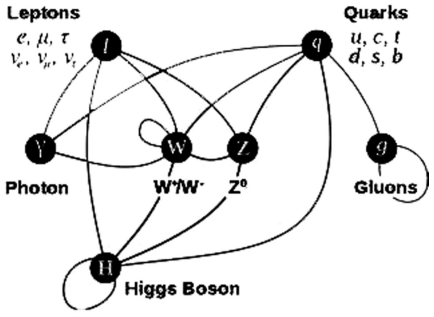

বিংশ শতাব্দীতে পরমাণুর গঠন কাঠামো সম্পর্কিত গবেষণা এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, নিউটন থেকে ম্যাক্সওয়েল পর্যন্ত সময়কালের তত্ত্ব দ্বারা তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল না। হাইসেনবার্গ-এর অনিশ্চয়তা সূত্র তা আরও স্পষ্ট করে তুলল। আবির্ভাব ঘটল কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যে কোন চার্জ যুক্ত কণা যে কোন সময় "ফোটন" গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। তড়িৎচুম্বকীয় ক্রিয়াকলাপ "ফোটন" লেনদেন-এর মাধ্যমেই ঘটে। ফোটনের ভর শূন্য, পুরোটাই গতিশক্তি। মৃদু বলের বেলায় সংঘর্ষের সম্ভাবনা বাড়তে থাকে শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। মৃদু বলের ক্রিয়ার সময় W^+, W^- এবং Z^0 – এই তিন প্রকার বলকণা দেখা যায়। W এর ভর প্রোটনের ভর এর ৮৬ গুণ এবং Z এর ভর প্রোটনের ভরের ৯৭ গুণ। W কণার স্পিন 1, চার্জ $\pm e$ এবং Z – স্পিন 1, চার্জ শূন্য।

বোসন কণা কী ?

যে সব সাব অ্যাটমিক পারটিকেল বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান (B-E Statistic) মেনে চলে তাদের "বোসন" কণা বলা হয়। আর যে সব সাব অ্যাটমিক পারটিকেল ফারমি-ডিরাক পরিসংখ্যান (F-D Statistic) মেনে চলে তাদের "ফার্মিয়ন" বলা হয়। বলকণাগুলি যেহেতু B-E Statistic মেনে চলে তাই সমস্ত বলকণাই বোসন কণা।

হিগস্ ফিল্ড এবং হিগ্‌স বোসন

আবিষ্কৃত বিভিন্ন মৌলিক কণাগুলির ভরের বিভিন্নতা নিয়ে ১৯৬০-এর দশকে বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাত্ত্বিক গবেষণা শুরু হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির "মহাবিস্ফোরণ" তত্ত্ব (বিগ ব্যাং থিওরি) অনুসারে বিস্ফোরণের মুহূর্তে মহাশূন্যে ছিল অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিপুঞ্জ। বিস্ফোরিত হওয়ার 10^{-37} সেকেন্ডের মধ্যে এই শক্তিপুঞ্জ ছড়িয়ে পরে এবং 10^{-11} সেকেন্ডের মধ্যে "কোয়ার্ক-গ্লুওন-প্লাজমা" আবির্ভূত হয়। 10^{-6} সেকেন্ডের মধ্যে, "কোয়ার্ক-গ্লুওন-প্লাজমা" থেকে প্রোটন, নিউট্রন এবং শেষ পর্যন্ত পরমাণু, অনু ইত্যাদি ভরযুক্ত কণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু কী ভাবে এই ভরযুক্ত কণা সৃষ্টি হয়? এবিষয়ে ১৯৬৪ সালে, "ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স" (পি আর এল) পত্রিকায় তিনটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। একটি গবেষণা পত্র ছিল রবেয়ার ব্রু ও ফ্রাঁসোয়া অংলেয়ার-এর, দ্বিতীয় গবেষণা পত্রটি ছিল জেরাল্ড গুরালনিক, কার্ল হেগেন ও টম কিবল্-এর এবং তৃতীয় গবেষণা পত্রটি ছিল পিটার হিগস-এর।

পিটার হিগস তাঁর গবেষণা পত্রে প্রকাশ করেন যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় মহাকাশ ব্যাপ্ত ছিল এক, "কোয়ান্টাম বলক্ষেত্র দ্বারা"। এই বলক্ষেত্রেই শক্তিগুচ্ছের মধ্য থেকে ভরকণার সৃষ্টি হয়, এই বলক্ষেত্রের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের বিক্রিয়ায় বিভিন্ন ভরের মৌলিক কণা সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই মৌলিক কণা সমূহের সংযোগ সাধনেই যৌগ কণার সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানী হিগস কল্পিত এই বলক্ষেত্রই

হল, হিগস বলক্ষেত্র। প্রতিটি বলক্ষেত্রের যেহেতু একটি করে বলকণার উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা গেছে, সেহেতু হিগস বলক্ষেত্রেরও একটি বলকণার সম্ভাবনা কল্পনা করা হল। এই কল্পিত কণাটিই হিগস কণা (Higg's perticle) বলকণাগুলি যেহেতু B-E Statistic মেনে চলে, তাই কল্পনা করা হয় হিগস কণাও এই পরিসংখ্যা মেনে চলবে। আর যেসব কণা এই পরিসংখ্যান মেনে চলে তারাই তো বোসন কণা। এই কারণে "হিগস কণা" হল "হিগস বোসন"।

এই বলকে তড়িৎচুম্বকীয় বলের অনুরূপ ভাবতে গেলে, আদান প্রদানকারী বলকণার ভর শূন্য হওয়া উচিৎ, কিন্তু পরীক্ষায় জানা গেছে এদের ভর শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। ইয়ান ও মিলস-এর মতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিয়মগুলি কতকগুলি প্রতিসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিসাম্যের উপর ভিত্তি করে যে তাত্ত্বিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব তা থেকে বলের চরিত্র অনুমান করা যাবে। এদের মতে বলের আদান প্রদানকারী বলকণার ভর শূন্য হবে। কিন্তু তা তো নয়। এই সমস্যার সমাধান সূত্র পাওয়া গেল অয়চিরো নাম্ব ও জেফ্রি গোল্ডস্টোন-এর চিন্তাধারা থেকে। তারা বললেন প্রতিসাম্য সবসময় প্রত্যক্ষ না হলে পরোক্ষও হতে পারে। আর যদি পরোক্ষ প্রতিসাম্য হয় তবে লেনদেনের কণাগুলি ভরশূন্য না হয়ে ভরযুক্ত হবে।

বহু প্রস্তাবিত প্রক্রিয়ার মধ্যে সরলতম হল ইলেকট্রো উইক সিমেট্রি ভাঙ্গনের ফলে মৌলিক কণাগুলি ভর অর্জন করে। পথ প্রদর্শনকারী ব্যাখ্যা হল, এইরূপ একটি ক্ষেত্রের অস্তিত্ব যার কোথাওই শক্তি শূন্য নয়, এমনকি মহাশূন্যের শূন্য স্থানের মধ্যেও নয় এবং যখন কোনও কণা এই ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্রিয়াশীল হয় তখন তা ভর লাভ করে।

স্ট্যান্ডার্ড মডেল

আবিষ্কৃত বস্তুকণা ও বলকণাগুলিকে তাত্ত্বিকভাবে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে সাজানো সম্ভব হল, যে সজ্জা পদ্ধতি পরমাণু জগতের প্রায় সমস্ত সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত বহন করে। একেই স্ট্যান্ডার্ড মডেল বলা হয়। কিন্তু "জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি" সংক্রান্ত প্রশ্ন এই মডেল সমাধান করতে পারে নি। এই মডেল প্রথমে তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে পরীক্ষামূলক প্রদর্শনের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। পরমাণু জগতের ক্ষেত্রে, প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান চারটি বলক্ষেত্রের মধ্যে তিনটি সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান। এগুলি হল তড়িৎচুম্বকীয় বলক্ষেত্র, দৃঢ় বলক্ষেত্র ও মৃদুবলক্ষেত্র। স্ট্যান্ডার্ড মডেলের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল তড়িৎচুম্বকীয় বলের ও মৃদুবলের সংযুক্তি সাধনের ফলে। এই ভাবনার উদ্ভাবক ছিলেন সেলডন গ্ল্যাশ। ১৯৬৭ সালে স্টিফেন ওয়ানবার্গ ও আবদুস সালাম গ্ল্যাশ'র তত্ত্বের সঙ্গে হিগস-এর তত্ত্বকে জুড়ে দিয়ে "ইলেকট্রো উইক" তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এই দুই রকম বলের কথা এক সঙ্গে ধারণা করলে চারটে বলকণার প্রয়োজন হয়, এগুলি হল W^+, W^-, Z^0 এবং ফোটন কণা। ১৯৮৩-তে W^+, W^-, এবং Z^0 কণা তিনটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হতো W ও Z দুটি সাধারণ কণা। যারা মৌলিক কণাগুলির সঙ্গে ক্রিয়াশীল। কিন্তু গাণিতিক ব্যাখ্যায় W ও Z কণার বিশাল ভর, ওদের স্ট্যান্ডার্ড মডেল-এ অবস্থান, অসঙ্গতি প্রকাশ করে। এই অসঙ্গতি দূর করতে পদার্থবিদরা ধারণা করেন SM-এ অবশ্যই অন্ততঃ পক্ষে আরো একটি কণিকার সন্ধান পাওয়া যাবে। এই অজ্ঞাত কণাটিই "হিগস বোসন"। অনেক বৈজ্ঞানিকের ধারণা ছিল একাধিক বোসন কণার সন্ধান পাওয়া যাবে।

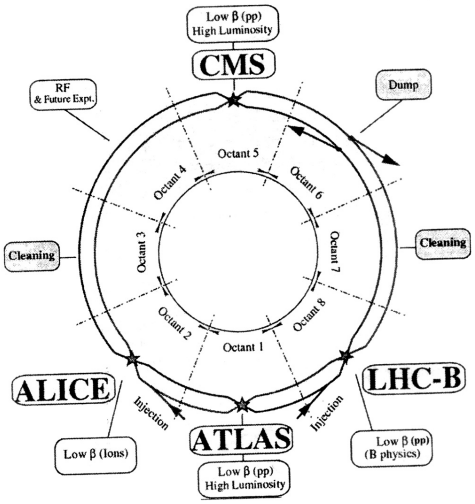

অ্যাটলাস ও সিএমএস ডিটেক্টর দুটির অবস্থান

ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য এই SM তৈরী হয় কোয়ান্টাম ফিল্ড এবং সিমেট্রি এর উপর ভিত্তি করে। প্রাথমিক অবস্থায় স্ট্যান্ডার্ড মডেল-এ মৌলিক কণার ভর সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা ছিল না। যা পরিষ্কারভাবে দেখায় যে এই প্রাথমিক মডেল অসম্পূর্ণ ছিল। ১৯৬৪ সালে পিটার হিগস সহ ছয়জন গবেষক – গবেষণা পত্রে দেখান যে কিরূপে মৌলকণা ভর

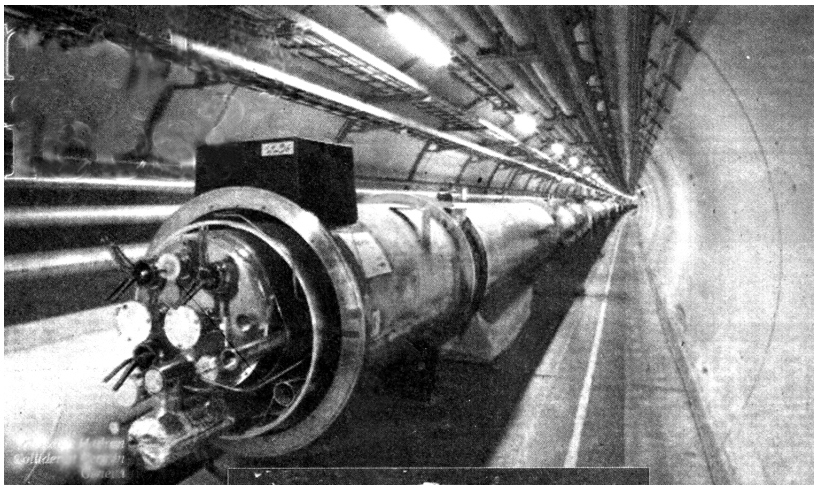

লার্জ হ্যাডরন কোলাইডার

যুক্ত হচ্ছে – এই পদ্ধতিটি হল স্পন্টেনিয়াস সিমেট্রি ব্রেকিং – এটিই হলো হিগস মেকানিজম।

প্রকৃতির মধ্যে বহু ধরণের প্রতিসাম্য (সিমেট্রি) আছে। যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙ্গে যায়। স্ট্যান্ডার্ড মডেল-এর সাপেক্ষে হিগস মেকানিজম প্রায় সবসময় সম্পর্কিত হয় ইলেকট্রো-উইক ফিল্ড-এর সিমেট্রি ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানীদের ধারণা "হিগস মেকানিজম"ই ফারমিয়ন এবং W ও Z বোসন কণাকে ভর প্রদান করে। কোয়ার্ক ও লেপটন একইভাবে ভর অর্জন করে।

হিগস বোসনের সন্ধানে

টপ কোয়ার্ক ও টাউয়ন নিউট্রিনো আবিষ্কারের পরে "হিগস বোসন" ব্যতীত, স্ট্যান্ডার্ড মডেলের, সমস্ত মৌলিক কণার উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া গেল। হিগস কণার খোঁজ শুরু হয় ইউরোপের সার্ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মিল্যাব গবেষণা কেন্দ্রে। স্ট্যান্ডার্ড মডেল হিগস বোসন কণার ভর সম্বন্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট মান স্থির করা যায় নি। অনুমান করা হয় এর ভর 115-180 Gev/c^2-এর মধ্যে হতে পারে। W ও Z কণা আবিষ্কৃত হয়েছিল, "সুপার প্রোটন সিনক্রোটন" যন্ত্রে। কিন্তু হিগস বোসনের জন্য অধিক ক্ষমতা যুক্ত কণা ভাঙ্গন যন্ত্রের প্রয়োজন। কণা ত্বরণ যন্ত্রে, শক্তিশালী চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে ইলেকট্রন বা প্রোটনের ন্যায় আধান যুক্ত কণাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে তার ত্বরণ, গতি তথা শক্তিবৃদ্ধি করা হত। কিন্তু কোলাইডার যন্ত্রে বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা উচ্চ গতি সম্পন্ন দুটি কণার মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করা হয়। এখন পর্যন্ত এইরূপ দুটি যন্ত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমটি সার্ন-এ লার্জ ইলেকট্রন-পজিট্রন কোলাইডার (এল ই পি)। এটি সক্রিয় ছিল ১৯৮৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত । দ্বিতীয়টি হল সার্ন-এ লার্জ হ্যাডরন কোলাইডার (এল এইচ সি) এর মেয়াদ ২০০৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত। এই হিগস বোসনের খোঁজে গবেষকরা উচ্চ গতির বিভিন্ন কণাগুলির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। সংঘর্ষে যদি যথেষ্ট উচ্চ শক্তি সৃষ্টি হয় যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। যাদের মধ্যে একটি হতে পারে হিগস বোসন। যার অস্তিত্ব এক সেকেন্ডের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সময় কাল এবং দ্রুত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে অন্য কণায় পরিণত হয়। এই কারণে হিগস বোসনের অনুসন্ধানে, পরিবর্তিত কণাগুলির উপস্থিতি দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায়।

এল এইচ সি যন্ত্রে দুটি সমান্তরাল পাইপ চারটি সংযোগস্থলে সংযুক্ত। এই চারটি সংযোগ স্থলে চারটে কণা প্রদর্শন যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা প্রোটনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা প্রদর্শনের জন্য চারটে প্রধান প্রদর্শন যন্ত্র হল

১) ATLAS
২) CMS
৩) ALICE
৪) LHCb

"হিগস বোসন" কণা প্রদর্শনের জন্য ATLAS ও CMS যন্ত্র দুটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

এল ই পি কোলাইডার পরীক্ষায় দেখা গেছে হিগস বোসনের ভর 114.4 Gev/c^2 এর কম হতে পারে না। পরবর্তীতে ফারমিল্যাব-এর ট্রেভট্রন পরীক্ষায় বোঝা যায় এই কণার ভর 185 Gev/c^2 এর বেশী হতে পারে না। সুতরাং হিগস বোসনের ভর 115-185 Gev/c^2 এর মধ্যবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে এল এইচ সি যন্ত্রে

ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষার ফলে, ৪ঠা জুলাই ২০১২ CMS ও ATLAS – উভয় প্রদর্শন যন্ত্রের গবেষকদের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে তারা যথাক্রমে $125.3 \pm 0.06 Gev/c^2$ এবং $126.5 Gev/c^2$ ভরযুক্ত কণার সন্ধান পেয়েছেন এবং পরীক্ষার ফল ৯৫% নির্ভুল বলে দাবি করেছেন।

ঐ দিন বিকেলে সার্ন-এর অধিকর্তা রলফ হয়্যার ঘোষণা করেন যে, একটি কণার সন্ধান পাওয়া গেছে যার চরিত্র হিগস বোসনের অনুরূপ। সুতরাং কণাটি হিগস বোসন হতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে ঐ কণাকে চিহ্নিত করতে আরও গবেষণা ও পরীক্ষ-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

সার্ন-এর বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস এল এইচ সি'র আয়ুষ্কালের মধ্যে তারা "হিগস বোসন" কণার উপস্থিতি সম্পর্কে আরও তথ্য সমৃদ্ধ হবেন। এর পরবর্তীতে, ২০১৮ সাল নাগাদ, "সুপার লার্জ হ্যাডরন কোলাইডার" (এস এল এইচ সি) নামক যন্ত্র উদ্বাবনের কথা ভাবা হয়েছে।

"হিগস কণা" কি ঈশ্বর কণা"!

সার্ন-এর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এই সংবাদ, "ঈশ্বর কণা" যুক্ত বিভিন্ন শিরোনামে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "ঈশ্বর কণা" নামটি অবশ্য যুক্ত হয়েছে আগেই। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী লেওন লেডারম্যান একটি বই লিখেছিলেন যার বিষয়বস্তুতে এই কণাটির পরিচয় ছিল। বইটির নামকরণ নিয়ে প্রকাশকের সঙ্গে লেডারম্যান সহমত হতে না পেরে বলেছিলেন বইটির নাম দেওয়া হোক, *"The God-damn particle"*। *"God-damn"* কথাটি ব্যবহৃত হয় "দুত্তেরিছাই" জাতীয় একটা ভাব বোঝাতে। কিন্তু বইটি যখন প্রকাশিত হলো তখন দেখা গেল *"damn"* অংশটি বাদ পড়ে নাম হয়েছে, *"The God particle"*। এতে শুধু প্রকাশকের ব্যবসায়িক স্বার্থই রক্ষা হয়নি, বিশ্ব জুড়ে ভাববাদী দর্শনের স্বার্থও রক্ষিত হয়েছে। "হিগস বোসন" আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বিগ ব্যাং তত্ত্ব প্রমাণিত হবে। ফলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কল্পিত সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের লীলা সাঙ্গ হবে। নাকচ হবে ঈশ্বর তত্ত্ব। তাই বাজারী সংবাদ মাধ্যম, "হিগস কণা"-কে "ঈশ্বর কণা" নামে অভিহিত করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া। বর্তমানে পুঁজিবাদ ও ভাববাদ অস্তিত্ব রক্ষায় একে অপরের পরিপূরক। পুঁজিবাদ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া। তাই বুর্জোয়া ব্যবস্থায় "হিগস কণা", "ঈশ্বর কণা" নামেই প্রচারিত হবে।

"হিগস বোসন" গবেষণা কিসের ইঙ্গিত দেয়

"হিগস বোসন"-এর সন্ধানে, ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড-এর সীমানায় জেনিভা শহরের কাছে, ভূগর্ভে ৪.৩ কিমি ব্যাসার্ধের এবং ২৭ কিমি লম্বা সুরঙ্গে এল এইচ সি যন্ত্রটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছিল ৮ বিলিয়নের বেশী মার্কিন ডলার। এই অর্থ জোগাড় হয়েছিল অসংখ্য বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান কর্মী, বিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষকদের দান এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুদান থেকে। এই যন্ত্র নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার যন্ত্র নির্মাণে অভিজ্ঞ কয়েকশো ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞান কর্মী। গবেষণার কাজে সার্ন-কে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন সারা বিশ্বের কয়েক হাজার বিজ্ঞান কর্মী।

বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন গবেষণা এবং সার্ন-এর গবেষণা থেকে লক্ষণীয় যে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক (প্র্যাকটিক্যাল) গবেষণাগুলি ব্যক্তি, দেশ, জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছে। যা ইঙ্গিত দিচ্ছে প্রকৃতিকে জানা, বোঝা এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম একক ব্যক্তি মানুষের নয়, সমগ্র মানবজাতির। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর সময়কালে "ম্যানহাটন" প্রোজেক্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় সাফল্য লাভ করেছিল, যদিও তার প্রয়োগ ছিল অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এক সাম্রাজ্যবাদীর দ্বারা অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে একে কাজে লাগিয়েছিল। এক লহমায় হিরোসিমা-নাগাসাকি শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। এই ঘটনাই প্রমাণ করে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের সমস্ত গবেষণা ও আবিষ্কার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্যবহৃত হয়, সমগ্র মানব জাতির স্বার্থে নয়। তাইতো সার্ন-এর গবেষণার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাজেটে অনুদানের বিষয়টি প্রাধান্য পায় নি। আমেরিকার ফারমিল্যাব-এ ট্রেভাট্রন যন্ত্রে গবেষণার কাজ ২০১১-এর সেপ্টেম্বরে বন্ধ হয়ে যায় বাজেট বরাদ্দ কমে যাওয়ার জন্য। এখন সারা বিশ্ব অপেক্ষা করে আছে সমস্ত বাধা পেরিয়ে এই গবেষণা তার অভীষ্ট লক্ষ্যে কবে পৌঁছায়।

[সাহায্যকারী পুস্তক : ১) ঈশ্বর কণা বা হিগস্ বোসন – দিলীপ বসু, ২) কনসেপ্ট অফ মডার্ন ফিজিক্স – বাইশার মহাজন এবং রায় চৌধুরী]

বানতলা থেকে কামদুনি ... এর শেষ কোথায়?

বানতলা থেকে লালগড়, পার্কস্ট্রীট থেকে কামদুনি, কাটোয়া থেকে গেঁদে, দিল্লী থেকে কোলকাতা, কাশ্মীর থেকে মণিপুর, ডায়মন্ডহারবার থেকে পার্লহারবার পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ধর্ষণের মত ঘটনা নিয়মিত ঘটেই চলেছে। দিল্লী, কলকাতা, ইম্ফল, কামদুনির মত বহু অঞ্চলে সাধারণ মানুষ পথে নেমে এর প্রতিকার চাইছেন, প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে নেতা-মন্ত্রীদের প্রতিশ্রুতির বাণী। দাবী উঠছে ন্যায্য বিচারের, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির। সর্বত্র আওয়াজ উঠছে ধর্ষকদের ফাঁসি চাই।

বাস্তবে প্রতিদিন, গ্রাম-শহর-গঞ্জে কত মহিলা ধর্ষিতা হন, কতজনের শ্লীলতাহানি হয় তার খবর কে রাখে! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো (এন সি আর বি)-র রিপোর্ট অনুসারে ২০১১ এবং ২০১২-র মত ২০১৩ সালেও মহিলাদের উপর অত্যাচারের নিরীখে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দেশের মধ্যে সবার উপরে। এ প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার বলেছে যে এ রাজ্যে অভিযোগ নথিভুক্তির হার অন্য রাজ্যগুলির চেয়ে বেশী। রাজ্য সরকারের এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে সারা দেশ সহ এ রাজ্যের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত না হয়ে চাপা পড়ে যায়। ধর্ষণের ঘটনা চাপা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজে মহিলাদের ভূমিকাই বেশী কারণ ধর্ষিতা হওয়ার জন্য যে অপমান তাকে সহ্য করতে হয় ঘটনা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হলে সামাজিকভাবে তাকে এর চেয়ে অনেক বেশী অপমান সইতে হয়। এই কারণে মহিলা নিজে অথবা পরিবারের পক্ষ থেকেই খবরটি চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা থাকে সবচেয়ে বেশী। আবার অনেক ঘটনা স্থানীয়ভাবে জানাজানি হলেও সংবাদে আসে না। আর ধর্ষকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্থিক বা রাজনৈতিকভাবে প্রতিপত্তিশালী হয়ে থাকে বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষিতা বা তার পরিবারের অভিযোগ থানায় নথিভুক্তই হয় না। এছাড়া বহু এলাকায় রাস্তায় পাগলীকে গর্ভবতী হতে দেখা যায়, ইঁটাভাটা, চা বাগান, ছোট-বড় শিল্প এমনকি অফিসে কর্মরতাদের উপর মালিক-ম্যানেজার-অফিসারদের অত্যাচারের কোনও খবর প্রকাশিত হয় না। সাত থেকে সত্তর এই অত্যাচার সহ্য করতে হয় সব বয়সী মেয়েদেরই।

তাই অনেকেই বলে থাকেন এ সমস্যার সুরাহা হবে না। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, এমনকি মৃত্যুদন্ড দিলেও এই ধরনের ঘৃণ্য সামাজিক অপরাধ কমবে না। ২০০৪ সালে ধনঞ্জয়ের ফাঁসীর পর ধর্ষণের ঘটনা এরাজ্যে কমেনি বরং বেড়েছে। বুদ্ধিজীবী মহল, নারী আন্দোলনের নেত্রীরাও টিভি চ্যানেলের আলোচনায় বা পত্রিকার আর্টিকেল লেখার সময় ঘটনার অবসান হবে না ধরে নিয়ে তা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির কথা বলে থাকেন। অনেকে আবার ঘটনাগুলি ঘটার জন্য মহিলাদের আচার-আচরণ, পোশাক-আশাককেই বেশী দায়ী করেন। প্রখ্যাত সিনেমা হিরো তথা এম এল এ চিরঞ্জিত তো বারাসতে ঘটা এক ধর্ষণের ঘটনায় মহিলাদের পোশাককে দায়ী করেছেন। যারা মহিলাদের এখনো ঘরেই আটকে রাখার কথা বলেন তারা তো এইসব নির্যাতনের জন্য মহিলাদেরই সরাসরি দায়ী করে থাকেন এবং বলেন 'আগুণ ও ঘি' এক জায়গায় রাখলে এমন হবেই।

সে যাই হোক নারী নির্যাতনের চিরতরে অবসান করতে হলে তার উৎস সম্পর্কে আমদের আগে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

নারী নির্যাতন এবং পিতৃতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার উৎস

সমাজ বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে মানুষের ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিলো যখন নারী পুরুষ মিলেই উৎপাদন কাজে সমান অংশ নিতো। সে আমাদের আদি ইতিহাস – যার কিছু চিহ্ন এখনও দেখা যায় আদিম জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে। সেখানে যা উৎপাদন হতো (ফলমূল আহরণ, শিকার ইত্যাদির মাধ্যমে) তার উপর অধিকার ছিলো নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র জনগোষ্ঠীর। ফলে সেখানে নারীর মর্যাদা আর পুরুষের মর্যাদায় কোন প্রভেদ ছিলো না। নারী পুরুষ শক্তি সম্পর্ক ছিলো সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কাল প্রবাহে মানুষ পশুকে গৃহপালিত করতে শিখলো এবং কৃষিকাজের উদ্ভব ঘটালো। এখন তার কাছে আছে ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত (উদ্বৃত্ত) উৎপাদন। এই প্রথম সম্পদের সঞ্চয় শুরু হলো। শুরু হল বিনিময়। অন্যদিকে এই উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কাজের ভাগ বাটোয়ারা বেড়ে চলছিলো। গোষ্ঠী সমাজের নারীদের গৃহস্থালির কাজ আরও বেড়ে গেলো আর উৎপাদনশীল কাজে গেলো পুরুষরা। ফলে উৎপাদনশীল

কাজ থেকে নারীরা ক্রমশ দূরে সরছিলো। এই সময়ই সমাজে ব্যক্তি মালিকানা ক্রমশ বিকশিত রূপ নিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের বড় বড় ব্যক্তি মালিকের (দাসপ্রভুর) উদ্ভব ঘটে। তৈরী হয় শ্রেণী বিভক্ত সমাজ – অসাম্য যার ভিত্তি – একদিকে তারা যাদের হাতে রয়েছে উদ্বৃত্ত সম্পদ অন্য দিকে যারা নিঃস্ব। এই যুগেই সৃষ্টি হলো আর একটি অসাম্য – নারী ও পুরুষের অসাম্য।

অসাম্য বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটতে লাগলো। আগের গোষ্ঠী সমাজের সামাজিক মালিকানার স্থান নিলো ব্যক্তি মালিকানা। মালিকরা তাদের অর্জিত সম্পদের উত্তরাধিকার তারই ঔরসজাত সন্তানের হাতে তুলে দেবার তাগিদে তৈরী করলো 'পরিবার'। এই পরিবারে নারী হলো বন্দিনী – যেখানে সে সন্তান পুনরুৎপাদন ও প্রতিপালন ছাড়া সেবা করে যায় অন্যান্য সদস্যদের।

ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক সমাজের এই পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি হলো এখন সমাজের একক – (ইউনিট) যার মাথার উপর থাকে সম্পত্তির মালিক পুরুষটি আর তার নীচে তার স্ত্রী, সন্তান। শক্তি সম্পর্কে (Power relation) পুরুষের অধীন হলো স্ত্রী কারণ উৎপাদনশীল কাজে সম্পত্তির সঞ্চালন করে সেই – সে এখানে কর্তা, প্রভু, স্বামী – তার নামেই সম্পত্তি, তার নামেই সন্তানের পরিচয়, তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তারই পুত্র – এর নিশ্চয়তা দিতে স্ত্রীকে গৃহ বন্দী করে নিরন্তর পাহারায় রাখা হলো। সাম দন্ড ভেদে নারীকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকে শাস্ত্র সম্মত করা হলো। এই পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি শাসকরা চাপিয়ে দিলো গোটা সমাজের কাঁধে। এটাই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো। এই প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত মালিকানার স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়ানো।

এখন প্রশ্ন হল কিভাবে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যক্তি মালিকের স্বার্থের সেবা করে ?

প্রথম কারণটা আগে বলা হয়েছে সেটা হলো নিজ উত্তরসূরীতে মালিক শ্রেণীর সম্পত্তির হস্তান্তরের নিশ্চয়তা দান।

দ্বিতীয়তঃ শ্রমজীবী জনতার ঘরের শিশুদের জন্ম দেওয়া ও প্রতিপালনের পুরো ভারটাই পিতৃতান্ত্রিক শ্রমজীবী পরিবারে বিনা মূল্যে সম্পাদন করার মাধ্যমে গৃহবন্দী নারী শ্রমের যোগানকে অব্যাহত রাখে – মালিকের কোন খরচ নাই।

তৃতীয়তঃ নিপীড়িত নারী সমগ্রভাবে পুরুষ সমাজকেই দায়ী করে তার নীচু অবস্থানের জন্য ফলতঃ শ্রমজীবী নারী পুরুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে ভাঙ্গন টিঁকিয়ে রাখা যায়।

চতুর্থতঃ আমাদের বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী পরিবারের ভিতরে শক্তি সম্পর্কে হীন মহিলাদের তুলনামূলক অনেক কম মজুরীতে খাটান যায়।

উপরে বর্ণিত কারণেই তাই যুগ যুগ ধরে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোটিকে শাসকরা 'পবিত্র প্রতিষ্ঠান' রূপে প্রচার করে চলেছে। অথচ আমরা দেখলাম এর অভ্যন্তরে পুরুষটি হলো প্রভু আর নারী কেবল সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের যন্ত্র মাত্র। নারীদের এই অবস্থানকে স্থায়িত্ব দিতে 'সতী-সাধ্বী', কমনীয়, সহনশীল, পতিদেবতার চরণে নিবেদিত, ত্যাগের প্রতিমূর্তি হিসাবে উপস্থাপিত করা হলো। আর এই আচ্ছাদনের তলায় চলতে থাকল তার উপর নিপীড়ন – একমাত্র আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই নারীর উপর এই চূড়ান্ত শোষণকে প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দাস যুগ থেকেই দার্শনিকরা পিতৃতন্ত্রের পক্ষে সওয়াল করে এসেছেন। অ্যারিস্টটল এবং প্লুটো ছিলেন এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন মহিলারা মানুষই নয়। পুরুষদের সেবা করাই তাঁদের ধর্ম। মনু বলেছিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পুরুষদের শুদ্র নারীকে ভোগ করার পূর্ণ অধিকার আছে। কারণ শুদ্রদের কাজ অপর তিনটি শ্রেণীকে সেবা করা। সনাতন হিন্দু ধর্মে মহিলাদের ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক, সম্পত্তি এবং রাজনৈতিক কোনও অধিকারকেই স্বীকার করা হয়নি। মেয়েরা এই সমাজে পুরুষের সেবা করার জন্য এবং সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া কিছু না। ইসলাম ধর্মও মহিলাদের কোনও সামাজিক অধিকার স্বীকার করে নি এবং স্বামী-পুত্রের সেবাই বেহস্তে যাওয়ার একমাত্র পথ হিসাবে বর্ণনা করেছে। খ্রীষ্ট ধর্মেও স্বামীকে মান্য (obey) করে চলার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই একই ছবি দেখা যায়। নাটক, সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস সর্বত্র আমরা এই দর্শনকে তুলে ধরতে দেখে আসছি।

দাস বা সামন্তযুগে নারীর সামাজিক অধিকারের দাবীটিই উঠে আসেনি কারণ এই সময় নারী ভোগ আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারীকে তার গৃহ থেকে পুঁজির প্রয়োজনেই বের করে নিয়ে আসা হয়েছে উৎপাদনশীল কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটি রেখেছে অক্ষত। কর্মরতা নারী এখানে দুধরনের শোষণের শিকার –

একদিকে মজুরী শ্রমিক হিসাবে মালিকশ্রেণীর অন্যদিকে পরিবারের ভিতরে ও সেই মালিকশ্রেণীর স্বার্থে চাপিয়ে দেওয়া পুরুষতান্ত্রিকতার শোষণ। পাশাপাশি সামাজিক উৎপাদনে যুক্ত

হওয়ায় পুঁজিবাদী সমাজে নারী আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকারের দাবীটিও উঠে এসেছে।

কিন্তু নারী নির্যাতন, চিরভোগ্য হিসাবে তার উপর পরিবার অভ্যন্তরে কিংবা কর্মক্ষেত্রে শক্তি সম্পর্কে উঁচুতে অধিষ্ঠিত শ্রেণীর দ্বারা তার উপর যৌন নিপীড়ন চলেই আসছে। ধর্ষণকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর পূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মূল সংজ্ঞা দ্বারা দেখলে গৃহের অভ্যন্তরে প্রায় প্রতিটি নারীই ধর্ষিতা হয় – যদিও একে চালু সামাজিক দৃষ্টিতে ধর্ষণ বলে ধরা হয় না।

বুর্জোয়া ব্যবস্থা সকল সম্পদকেই পণ্যে (যা বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা যায়) পরিণত করেছে। এমনকি মানব দেহকেও। অন্যসব পণ্যের মতোই নিপীড়িত শ্রেণীর নারীকে তোলা হচ্ছে বাজারে – বেশ্যাবৃত্তি, নারীর নগ্নতা প্রকাশে বিনিয়োগ করে মুনাফা কামানো তাই এই সমাজের অঙ্গ ভূষণ যদিও বেবেলের মতে দাস যুগেই অত্যাচারিত দাস নারীদের একাংশ প্রতিবাদের রূপ হিসাবে দেহপসারণীর কাজে যুক্ত হন সামন্তযুগেও তা চালু ছিল। বুর্জোয়া সমাজ তাকে নবরূপ দান করেছে মাত্র। উল্টো দিকে শাসক শ্রেণীর নারীরা পুরুষ দেহকেও ভোগ করে অর্থের বিনিময়ে। আজ পর্ণোগ্রাফি হয়ে উঠেছে এক বিশাল মুনাফাদায়ী শিল্প। নগ্নতা প্রদর্শনকে প্রচার করা হচ্ছে নারীর অহংকার হিসাবে। দেহ পসারিনী আজ বলিউডের নায়িকা (সানি লিওনে) এ দেখেই বড় হচ্ছে আগামী প্রজন্ম। ইন্টারনেটে কয়েক লক্ষ পর্ণো সাইট, যাতে ঘরে বসে নগ্নতা উপভোগ ছাড়াও যৌন সম্ভোগের ডেট ঠিক করা যাচ্ছে নিমেষে। এই সামগ্রিক পণ্যায়নের সংস্কৃতি নারী মননকেও আক্রান্ত করেছে। নারী হিসাবে সাফল্যের মাপকাঠিটি তাই তৈরী হচ্ছে এভাবে। পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে আক্রান্ত তার মনন তাকেও ভাবতে শেখাচ্ছে নিজেকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে তুলে ধরতে।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে যৌন নিপীড়নে আক্রান্ত হওয়ার পেছনে নারীদের কি কোনও অপরাধ নেই?

এ বিষয়ে সমাজে চালু অভিব্যক্তি হলো – কোন মেয়ে ধর্ষিতা বা বিকৃতকাম মানসিকতার শিকার হলে পরে প্রথমেই মেয়েটির চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় দ্বিতীয়ত বলা হয় তার পোশাক ছিলো প্রচণ্ড যৌনতা উদ্রেককারী। ধর্ষণ কমাতে অনেকে ড্রেস কোড চালু করার কথা বলে অথচ এইসব পোষাকগুলি তৈরী হয় এই সমাজেই। আধুনিক সমাজে বিজ্ঞানীরা পুরুষদের ও একাংশ নারীদের (যাদের মাথা বুর্জোয়া প্রচারে এলোমেলো হয়ে গেছে) এই ধরণের ব্যাখ্যাকে নাম দিয়েছে রেপ কালচার। একটু গভীরভাবে দেখলে এদের মন্তব্যগুলিতে এই রেপ কালচার-কে খুঁজে পাওয়া যায়। এ চিন্তাগুলির পেছনে আসলে কাজ করে সেই একই বিষয় মেয়েদের ভোগ্যপণ্য হিসাবে দেখা। মেয়েটি যেন একটি খাবার – পুরুষটি সুস্বাদু খাবার দেখলে তো লালায়িত হবেই – সে যে পুরুষ – সুতরাং ধর্ষণের দায় নারীটিরই। এই ধরনের চিন্তা দেখায় ভোগ্যপণ্য হিসাবে নারীকে দেখানোর মালিক শ্রেণীর প্রচেষ্টা কতো গভীরভাবে সমাজের একাংশের মনে প্রোথিত করা হয়েছে, তাদের করে তুলেছে রেপ কালচারের বাহক। ধর্ষণকামিতার উৎসগুলি এখানেই।

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের মত হিংসাত্মক আচরণ কিসের ইঙ্গিত?

মানুষকে যা পশু থেকে পৃথক করেছে তা হলো মানুষই একমাত্র প্রাণী যে উদ্দেশ্য মূলক সৃজনশীল উৎপাদনে সক্ষম। এই বৈশিষ্ট্যই (সচেতনভাবে শ্রম প্রয়োগে সৃজনশীল উৎপাদনে সক্ষমতা) তাকে দান করেছে মনুষ্যত্ব। কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মালিক শ্রেণী মানুষের কাছ থেকে তার এই বৈশিষ্ট্যকেই ছিনিয়ে নিয়েছে। শ্রমজীবী জনতা আজ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নাট বোল্ট টাইট করার মতো একঘেয়ে কাজ করে চলে দিনের পর দিন। যে শ্রম তার কাছে ছিলো সকল শক্তির উৎস সেই শ্রমদানই হয়ে পড়েছে বাধ্যতামূলক শ্রমদান – এ কাজ তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। "শ্রম তাকে আনন্দিত না ক'রে, ক'রে তোলে অসুখী"। উদ্দেশ্য মূলক সৃজনশীল শ্রম থেকে তার যে বিচ্ছিন্নতা তা তার মনুষ্যত্বকেই নষ্ট করে দেয়। মানুষের কাছ থেকে মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়ে তাকে যন্ত্রাংশে পরিণত করে আধুনিক ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক সমাজ তাকে পরিণত করেছে 'না-মানুষে'। শ্রমজীবী জনতার এই শক্তি হীনতার অনুভূতি (যার ভিত্তি রয়েছে উৎপাদন ক্ষেত্রে তার শোষণ ও শক্তিহীনতার মধ্যে) তাকে বাধ্য করে মালিকশ্রেণীর উপজ ধারণাগুলির কাছে আত্মসমর্পণে। উৎপাদন ক্ষেত্রে শক্তি সম্পর্কে নীচ অবস্থানে থাকা নির্যাতনের শিকার পুরুষটি তার সমস্ত মনুষ্যত্ব কেড়ে নেওয়ার ফলশ্রুতিতে জন্ম ক্রোধকে উগড়ে দেয় তার পরিবারের অভ্যন্তরে দুর্বলতর বা নীচ অবস্থানে থাকা নারীর উপর যৌন বা দৈহিক নিপীড়নের মাধ্যমে। কাজ না পাওয়া বিশাল অংশের মজুদ শ্রমবাহিনী (বেকার) ও একই রোগে আচ্ছন্ন। এর ফলেই ঘটে চলে যৌন বিকৃতির বিবিধ অভিব্যক্তি। অন্যদিকে মালিকশ্রেণীর কাছে শ্রমজীবী নিপীড়িত নারীদের ধর্ষণ হলো অধিকার। এছাড়া মালিকশ্রেণীর ছড়িয়ে দেওয়া সাংস্কৃতিক প্রভাব যা আগে

আলোচিত হয়েছে (পর্নোগ্রাফী ইত্যাদি) এরও একটা লক্ষ্য আছে – এর মাধ্যমে পরিকল্পিত ভাবে নিপীড়িত মানুষকে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিংড়ে ছিবড়ে করে দিয়ে তার সমাজে অবস্থান সম্পর্কে ভাবনার সুযোগকে নষ্ট করতে ক্ষণিকের যৌন সুখকে তার ক্লান্তি নিরসনের পন্থা হিসাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। যার পেছনে সে ছুটছে। জন্ম নিচ্ছে একের পর এক সামাজিক অপরাধ।

বিজ্ঞান কর্মী হিসাবে আমাদের কাজ কী ?

উপর উপর মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করার শুভ ইচ্ছে নিয়ে কাজ করলেই এই গভীর অসুখ দূর করা যাবে না এটা নিশ্চয়ই এই আলোচনায় স্পষ্ট। আমরা দেখলাম প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি সমূহ এই সমাজে টিকে থাকার উৎস ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরই উপজ। এই বিষয়ে জনতাকে সচেতন করার লক্ষ্যে স্বরূপ উন্মোচনকারী শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। শ্রমজীবী নারী পুরুষের উপর নির্মম অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরলে নারী পুরুষের বিভাজনের প্রয়াসকে ব্যর্থ করে শ্রমজীবী নারী পুরুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াইকে সাহায্য করা যাবে। একই সঙ্গে এই উৎসগুলির অবসানের লক্ষ্যে চলমান সংগ্রাম (অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম) এর পাশে বিজ্ঞান কর্মী হিসাবে আমাদের না দাঁড়ালে হাতুড়েপনাতেই আটকে থাকবে আমাদের প্রয়াস।

আলোচনা থেকে এটা বেড়িয়ে এল যে পিতৃতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাই নারী নির্যাতনের মূল কারণ। আবার এই পিতৃতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা টিঁকে আছে ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা টিঁকে থাকার কারণে। পিতৃতান্ত্রিক শাসনের অর্থ তাই পুরুষের শাসন নয়। সমাজের নিয়ম হিসাবে নারী শাসককেও একই আচরণ করতে দেখি আমরা। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহিলারা প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, বিচারক, সেনাবাহিনীর অফিসার পদে আছেন। ব্রাজিলে দিলমা রৌসেফ, বাংলাদেশে হাসিনা, ভারতে ইন্দিরা গান্ধী বা প্রতিভা পাতিলের শাসনে নারী নির্যাতন কমেনি। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তামিলনাড়ুতে জয়ললিতা সরকার থাকলেও নারী নির্যাতন বাড়ছে। রাজ্যের প্রাক্তন পুরুষ মুখ্যমন্ত্রী যেমন একবার বলেছিলেন 'এমন তো কতই হয়'। এখন বর্তমান মহিলা মুখ্যমন্ত্রীও বলছেন 'এসব তুচ্ছ ঘটনা', 'সাজানো ঘটনা' ইত্যাদি। প্রতিটি দেশেই দেখা যায় পুলিশ মিলিটারীকে আন্দোলনকারীদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ইত্যাদি তকমা দিয়ে সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন, মহিলাদের যথেচ্ছ নির্যাতন, ধর্ষণের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়। কাশ্মীর, মণিপুর কিংবা প্যালেস্তাইনে এমন ঘটনা নিয়মিত ঘটছে আর শাসকরা তাদের বাহিনীকে এরজন্য পুরস্কৃত করছেন।

প্রতিটি বিজ্ঞান ও সমাজ সচেতন মানুষকে বুঝতে হবে যে এটা নিছক পুরুষের বিরুদ্ধে নারীদের আন্দোলন নয়। এই অন্যায়ের অবসান করতে হলে ব্যক্তিমালিকানাধীন সমাজব্যবস্থার অবসানের লক্ষ্যে লড়তে হবে। শুধু ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নয়, তাদের মদত ও প্রশ্রয়দানকারী ব্যবস্থা অবসানের লক্ষ্যে জোটবদ্ধ হতে হবে। ■

[*তথ্যসূত্র ঃ বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং ত্রিপুরা'র নাট্য ভূমি গ্রুপ থিয়েটারের দ্বারা প্রকাশিত পার্থপ্রতিম আচার্যর রচনা।*]

বিজ্ঞপ্তি

সকল পাঠক বন্ধুর কাছে আবেদন, আপনারা পত্রিকার রচনা সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত সমালোচনা পাঠান। বিজ্ঞান ও কুসংস্কার বিষয়ক রচনা, রিপোর্ট পাঠান। রচনা পরিষ্কার হরফে, পাতার একদিকে লিখে পাঠাবেন এবং কপি রেখে পাঠাবেন। কবিতা ও রচনা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সম্পাদকমন্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। – সম্পাদক

নিবন্ধ

জ্যোতিষ বিজ্ঞান নয় – সচেতনভাবে টিঁকিয়ে রাখা কুসংস্কার

বর্তমান সময়ে আমাদের জীবনযাত্রা প্রতিদিন অনিশ্চিত থেকে অনিশ্চিততর হয়ে উঠছে। কলকারখানা যখন তখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কৃষকেরা ঋণ নিয়ে ফসল ফলিয়েও দাম পাবেন কিনা, ঝড়-বৃষ্টি বা পোকা লেগে তা নষ্ট হবে কিনা এই নিয়ে সব সময় চিন্তিত। পরীক্ষায় পাশ করা, পাশ করার পর চাকরি পাওয়া – না পাওয়া, মেয়ের জন্য সুপাত্র মিলবে কিনা, কঠিন অসুখ সারবে কিনা, বিনিয়োজিত টাকা সুদ সহ মিলবে কিনা ইত্যাদি হাজারো চিন্তা নিয়ে অধিকাংশ মানুষ ভয়-ভীতি-আশঙ্কায় জর্জরিত। জীবনের এই প্রতিদিনকার সমস্যার থেকে রেহাই পাওয়ার পথ অধিকাংশের কাছেই নেই। তাই এই অনিশ্চয়তাকে কপালের লিখন বলে মনে করেন অধিকাংশ মানুষ। পৃথিবীর বুকে এর সমাধান নাই মনে করে মাথার উপর যে আকাশ আমরা দেখতে পাই, যে মহাকাশেই মানুষের আদি বাসস্থান ছিল বলে পৌরাণিক কাহিনীতে শোনা যায় সেখানেই এই সমস্যার সমাধানের দিকে ছোটেন অচেতন মানুষ। মাথার উপর আকাশে নানা জ্যোতিষ্কে বসবাসকারী দেবতারাই যেহেতু জন্মের সময় মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন, তাই সেই দুর্ভাগ্যগুলি সৌভাগ্যে রূপান্তর করা যাবে জ্যোতিষ চর্চার মাধ্যমে, সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসা এই ধারণার বশবর্তী মানুষ তাই গ্রহ-নক্ষত্র-দেব-দেবীদের তুষ্ট করে তাদের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা পেতে জ্যোতিষবিদ্যা ও জ্যোতিষী বা ভাগ্য নিয়ন্ত্রকদের আশ্রয় নেয়।

বর্তমানে অজ্ঞানতাকে ভিত্তি করে সমস্যাজর্জরিত মানুষের মধ্যে এই জ্যোতিষচর্চা এক সামাজিক ব্যাধিতে রূপান্তরিত। ট্রামে-বাসে-ট্রেনে-অফিস-আদালত যেখানেই যান দেখবেন শতকরা প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষের হাতে, গলায়, কোমরে নানাপ্রকার পাথরের সমাহার, তাবিজ, কবজ, তাগা, মাদুলি, শেকড়, বাকড় আরও কত কি!

সাম্প্রতিককালে এই তথাকথিত ভাগ্যবদলের প্রচার শুধু মুখে মুখে হয় না। প্রতিদিন খবরে কাগজের পাতায় 'আপনার আজকের দিনটি' কলমে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কোটি কোটি জনতা। খবরে কাগজ, টিভি, সিনেমা, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভাগ্য বদলকারীদের প্রচার প্রতিদিন বাড়ছে। প্রায় প্রতিটি ভাষায় ৮-১০টা করে টিভি চ্যানেলে ভাগ্য বিচার এবং ভাগ্যবদলের নিদান শোনা যাচ্ছে। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং কপালের লিখন বদলের স্কুল কলেজ খুলছে। সেই সব তথাকথিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী জ্যোতিষেরা কম্পিউটারে গণনা করে যখন নিদান দিচ্ছেন তখন আতঙ্কিত সাধারণ মানুষের তার পিছনে ছুটে বেড়ানোকে শুধু অস্বাভাবিক আর মূর্খতার পরিচয় বলে উপেক্ষা করাকে আর সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন বলা যায় কি? এই সামাজিক ব্যাধি থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করা তাই বিজ্ঞান ও সমাজকর্মীদের কাছে এক বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই চ্যালেঞ্জকে বাস্তবায়িত করতে আমাদের বিষয়টির গভীরে যেতেই হবে। প্রথমে আমাদের জানতে হবে এই বিদ্যার উৎস কী?

জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ

সমস্ত প্রাচীন মানব সভ্যতায় বিজ্ঞানচর্চার একটা প্রধান বিষয় ছিল জ্যোতির্বিদ্যা। প্রাচীন ভারত, মিশর, চিন, গ্রীস, ব্যাবিলন অঞ্চলে, যেখানে সভ্যতার প্রথম বিকাশ ঘটেছে চিন্তাশীল মানুষ আকাশের সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদির গতিবিধি নিয়ে নানারকম পর্যবেক্ষণ ও মাপজোখ প্রাচীনকাল

থেকেই করে আসছেন। ঐ সময় সৌরবছর, চন্দ্রমাস, রাশিচক্র, সূর্যগ্রহণ, ক্রান্তি বিন্দুর অয়ন চলন, ধূমকেতু প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা তৈরী হলেও সূর্য, পৃথিবী, চাঁদ, অন্যান্য গ্রহ ও জ্যোতিষ্কদের পারস্পরিক গতি সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। এই চর্চাগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত দিক্ নির্ণয় ও কালের পরিমাপ করা, লোক ঠকানো নয়। মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকায় মায়া-আজটেক ও ইন্‌কা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকেও এই তথ্য পাওয়া যায়। ভারতে বৈদিক যুগ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর আর্যভট্টের সময় পর্যন্ত জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যা ছিল সমার্থক এবং জ্যোতিষ নামটি জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ বিদ্যা অর্থে প্রচলিত ছিল। ভারতে ষষ্ঠ শতব্দীতে গ্রহাবস্থান থেকে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণের হাতিয়ার হিসাবে ফলিত জ্যোতিষের সূচনা হয় বরাহমিহিরের আমল থেকে। তাঁর রচিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকাই এদেশে ফলিত জ্যোতিষের ভিত্তি। ক্রমশ ফলিত জ্যোতিষের কারবারীরা "জ্যোতিষ" নামটি পর্যন্ত আত্মসাৎ করে নেয়। এরফলে জ্যোতির্বিদ্যা নামক শব্দের জন্ম হয় ফলিত জ্যোতিষ থেকে পার্থক্যকরণের জন্য।

ভারতীয় জ্যোতিষকূল এবং সনাতন ধর্মের প্রচারকরা জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব (খোদ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাই নাকি এর প্রবক্তা!) এবং এদেশে তার উদ্ভবের কথা প্রচার করলেও তার কোনও ভিত্তি নাই। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড: মেঘনাদ সাহার মতে "রোমক ও পৌলিশ সিদ্ধান্ত আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে ভারতে আনীত হয়। বাস্তবিক পক্ষে পৌলিশ সিদ্ধান্ত-র [Paulas of Alexandria (376 AD)] জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে সংকলিত।"

বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে এটি আজ প্রমাণ করা যায় যে ভারতে ফলিত জ্যোতিষের চর্চা চতুর্থ শতাব্দীর চেয়ে প্রাচীন নয় এবং তা গ্রীস, রোম ও ব্যাবিলন থেকে আগত। কারণ হিসাবে বলা যায় –

১) রামায়ন-মহাভারতেও গ্রহাবস্থান থেকে ভাগ্যবিচারের কোনও উদাহরণ নেই।

২) জ্যোতিষে রোমক ও যবন সিদ্ধান্ত বলে দুটি গ্রন্থের কথা বলা আছে, যা থেকে বোঝা যায় যে রোম এবং যবন (গ্রীস) থেকে এর আগমণ।

৩) সাত দিনে সপ্তাহ বিচার দৃশ্যমান ৭ জ্যোতিষ্কের নামানুসারে হয়েছে। এই ৭ দৃশ্যমান গ্রহ ব্যাবিলনের ৭ দেবতার নামে। যদি ভারতীয় বিচারে বার হত তবে রাহু ও কেতুকে নিয়ে 'নবাহ' হত।

৪) ফলিত জ্যোতিষের বিচারে চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রী গ্রহ কিন্তু ভারতীয় বিচারে এঁরা দুজনেই পুরুষ।

৫) জ্যোতিষের সংশ্লিষ্ট হস্তরেখা বিচারকে সমুদ্র বিজ্ঞান বলা হয় কেন? কারণ সমুদ্রের ওপার থেকে এই অপবিজ্ঞান এদেশে এসেছে।

যাই হোক, এই অপবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে মানুষের অজ্ঞতা থেকে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন যে বহু প্রাচীন যুগ থেকেই কিছু মানুষ মনে করত যে মহাকাশে দৃশ্যমান জগতই হল মানুষের আদি বাসস্থান। সেখান থেকে শুরু হয় জ্যোতিষের চর্চা ('in the search for human meaning in the sky' - *wikipidia*)। প্রথম সংগঠিতভাবে জ্যোতিষ চর্চা শুরু হয় ব্যাবিলনে প্রায় ২ হাজার বছর আগে। এরপরই শুরু হয় কোন 'দুষ্ট গ্রহের রুষ্টতা' নিয়ে চর্চা। ধীরে ধীরে এই ফলিত জ্যোতিষ নানা মহাদেশে মানুষের 'সমস্যা সমাধানের উপায়' হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সমাজের শাসকবর্গের একটা অংশ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এই অপবিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে।

জ্যোতিষশাস্ত্রের কি কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে?

জ্যোতিষীরা দাবি করেন যে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত এবং নির্ভুল সুতরাং তারা দাবি করেন যে এই কারণে জ্যোতিষশাস্ত্র (অ্যাস্ট্রোলজি) হস্তরেখা চর্চা ইত্যাদি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের অনুমতি দিতে হবে। অতীতে দেশের সরকার এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিলেও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের বিরোধিতায় তা লাগু হয়নি। তবে ঘুরপথে এই অপবিজ্ঞান চর্চা ও লোক ঠকানোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রমরম করে চলছে ভাগ্যবিচার ও ভাগ্য পরিবর্তনের ব্যবসা আইনীভাবে।

জ্যোতিষশাস্ত্র (অ্যাস্ট্রোলজি) যে বিজ্ঞান নয় কল্পনা – তা বুঝতে গেলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বা অ্যাস্ট্রোনমি'র সাথে তার পার্থক্যগুলি আমাদের বুঝতে হবে। প্রথমে আমরা দেখব জ্যোতির্বিদ্যা প্রাচীনকাল থেকে বিকশিত হয়ে কিভাবে আজকের আধুনিক বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে।

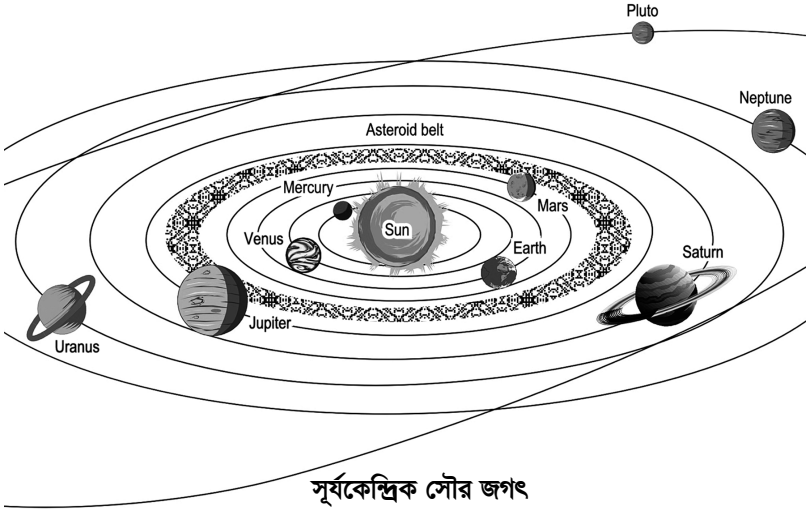

সূর্যকেন্দ্রিক সৌর জগৎ

জ্যোতির্বিদ্যা

২৫০ খ্রী. পূর্বাব্দ পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহরা প্রদক্ষিণ করছে। বিজ্ঞানী অ্যারিস্টারকাস সূর্যের আয়তন নির্ণয় করে যখন দেখলেন তা পৃথিবী অনেক অনেক বড় তখন তিনি পূর্বের ধারণাকে পরিত্যাগ করে সূর্যকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে রেখে পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলির বৃত্তাকার গতির যুগান্তকারী পরিকল্পনা করেন। অ্যারিস্টারকাসের এই ধারণা যাজক মহলে ও তৎকালীন বিদ্বজনের দ্বারা সমালোচিত হয়। হিপার্কাস ও তার শিষ্য টলেমি (খ্রীস্টপূর্ব ১৯০-খ্রীস্টপূর্ব ১২৫) নানা জ্যামিতিক কৌশল অবলম্বন করে ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা আবার প্রবর্তন করেন। অ্যারিস্টারকাসের সূর্যকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পরবর্তীকালে ভুল তত্ত্ব দ্বারা তা বাতিল হয়ে যায়।

বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দ) টলেমির সিদ্ধান্তের ভুল দিকগুলি গাণিতিক ব্যাখ্যা দ্বারা খন্ডন করে সৌরকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের ধারণাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচিত গ্রন্থ কমেন্টারিওলাস-এ (*Commentariolus*) তাঁর গবেষণার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন। যদিও তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে টলেমির ব্যাখ্যার কিছু প্রভাব থেকে যায় এবং তিনি টলেমি'র মতবাদের দুটি ভুলকে মেনে নেন যেমন ১) গ্রহগুলির গতিবেগ সমান; ২) গ্রহদের গতিপথ বৃত্তাকার।

কোপার্নিকাসের তত্ত্বের মধ্যে ত্রুটি ছিল পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যের। কোপার্নিকাসের তত্ত্বের তথ্যগত ত্রুটি দূর করার জন্য দুই জন বিজ্ঞানীর নিরলস প্রয়াস স্মরণীয়। বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬৩০ খ্রী.) গ্রহগুলির গতিপথ নির্ণয়ের কাজ শুরু করেন। রাজা ফ্রেডারিক-এর আনুকূল্যে জোহান কেপলার (১৫৫১-১৬৩০ খ্রী.) এই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন নিরন্তর পর্যবেক্ষণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায়। কেপলার তিনটি সূত্রের আবিষ্কার করেন – ১) গ্রহগুলি সূর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে এবং সূর্য থাকে তার নাভি বা ফোকাসে। ২) সূর্যের কেন্দ্র থেকে কোনও গ্রহের কেন্দ্র পর্যন্ত টানা কাল্পনিক রেখা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে। ৩) কোনও গ্রহের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময়ের বর্গ (Square) এবং সূর্য থেকে দূরত্বের ঘন (Cube) পরস্পর সমানুপাতিক (Proportional)।

১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে হল্যান্ডে প্রথম টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়। ইতালিতেও তার খবর আসে। ইতালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬২২ খ্রী.) নিজেই একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টেলিস্কোপের আবিষ্কার করেন এবং চাঁদের পাহাড় ও খাদ, বৃহস্পতির ৪টি উপগ্রহের উপস্থিতি এবং তাদের গ্রহণ, সূর্যের কলঙ্ক ও তার সরণ থেকে সূর্যের আহ্নিক ঘূর্ণন ইত্যাদি বহু মহাজাগতিক তথ্য আবিষ্কার করেন। বৃহস্পতির উপগ্রহ বৃহস্পতির চারদিকে ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে না – এই যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রমাণ করল পৃথিবী সব গতির কেন্দ্র নয়। আবার উপগ্রহগুলির গ্রহণের সময়ের পার্থক্যগুলিও অসমান এটা প্রমাণ করার পর তিনি নিশ্চিত হন পৃথিবী ও অন্য গ্রহরা সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। এই আবিষ্কারে জন্য বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে ব্রুণোর মতো (ব্রুণো'কে যাজকরা জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে) সারাজীবন যাজকদের রোষের শিকার হয়ে অন্ধকার কারাগারে জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

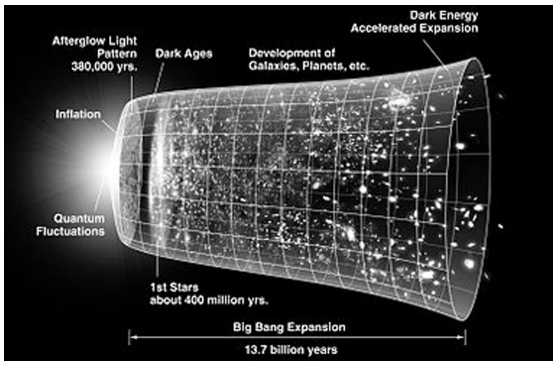

প্রসারমাণ মহাবিশ্ব (একটি মডেল)

বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রী.) সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে কেপলারের তিনটি সূত্র গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং মহাকর্ষ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বিতর্ক – সূর্য, পৃথিবী ও গ্রহদের পারস্পরিক গতির নিয়ম এতদিনকার অসংখ্য মানুষের চর্চায় নিশ্চিতভাবে আবিষ্কৃত হল।

জ্যোতির্বিদ্যা এখানেই থেমে থাকে নি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি ও তার উৎপত্তি ও বিকাশের গবেষণা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে দ্রুতগতিতে বিকশিত হয়ে চলেছে। আজ সার্নের বিজ্ঞানীরা সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তের বিজ্ঞানীরা মহাকাশ বিজ্ঞান বা কসমোলজির ব্যাপক বিকাশ ঘটিয়েছেন।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এবং বিজ্ঞানী মিনক্‌ভস্কি মডেল অনুযায়ী এই বিশ্বব্রহ্মান্ড চতুর্মাত্রিক (ফোর ডাইমেনশনাল) এবং অতিগোলক (হাইপারস্ফিয়ার), যা বিজ্ঞানী হাব্‌ল্-এর সূত্র অনুসারে ক্রমশ বাড়ছে। এই বিশ্বে বিরাট মহাশূণ্যের মাঝে মাঝে বেশ কিছু নীহারিকা (নেবুলা) গুচ্ছ বেঁধে রয়েছে। এই নীহারিকাগুলি অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি। আমাদের নীহারিকা,যাতে সূর্য অবস্থিত, তাকে আমরা বলি ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা (মিল্কি ওয়ে, গ্যালাক্সি)। এটি আকারে সর্পিল বা কুন্ডলাকৃতি (স্পাইরাল) চাকতি'র (ডিস্ক) মত। এই ছায়াপথ, অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা, কোলস্যাক নীহারিকা, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ম্যাজেলানিক ক্লাউড, অশ্বমুন্ড (হর্স হেড) নীহারিকা প্রভৃতি কয়েকটি নিয়ে একটি নীহারিকাগুচ্ছ (সুপার গ্যালাকটিক ক্লাস্টার)। এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের যতদূর দেখা যায় তাতে শুধু নীহারিকাগুচ্ছের পর নীহারিকাগুচ্ছ। এই গুচ্ছগুলি পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আবার গুচ্ছের অন্তর্গত নীহারিকগুলিও পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই মহাবিশ্বের আয়তন বাড়ছে (এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স)। কিন্তু একটি নীহারিকা আয়তনে বাড়ছে না। [ছবি]

আমাদের ছায়াপথের চাকতির প্রান্তের দিকে কিছু স্থানীয় তারার সঙ্গে সূর্য তার পরিবারবর্গ নিয়ে অবস্থান করছে। সূর্য একটি মাঝারি মাপের হলদেটে তারা। সূর্যকে মাঝে রেখে নয়টি গ্রহ নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। এই গ্রহগুলির কয়েকটির আবার উপগ্রহ আছে, যারা সেই গ্রহের চারদিকে ঘুরছে। এই গ্রহ উপগ্রহের পরিবার নিয়ে আমাদের সৌরজগৎ। [ছবি]

এছাড়া ধুমকেতু, উল্কা প্রভৃতি কিছু অস্থায়ী বাসিন্দা এই সৌরজগতে ক্ষণিকের অতিথি হয়।

সূর্যও স্থির নয়। সৌরজগতের ক্ষেত্রে সূর্যকে আপেক্ষিকভাবে স্থির ধরা হয়। সূর্যের নয়টি গ্রহ ছাড়াও মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের ঝাঁক বা গ্রহাণুপুঞ্জ (অ্যাস্টেরয়েড)। সূর্য ও তার গ্রহ-উপগ্রহগুলি নিম্নরূপ ঃ

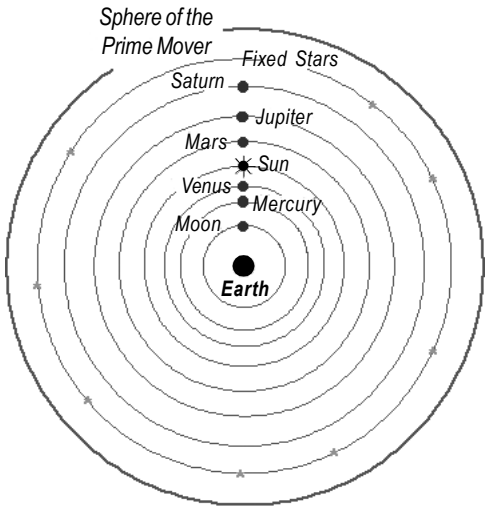

Aristotle's Universe

ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের অ্যারিস্টটলের কল্পনা

বুধ	–	উপগ্রহ নাই	
শুক্র	–	”	
পৃথিবী	–	১	(চন্দ্র)
মঙ্গল	–	২	

বৃহস্পতি – ৬৭ (আরও আবিষ্কৃত হচ্ছে)
শনি – ১৭ ”
ইউরেনাস – ১৫ ”
নেপচুন – ২১ ”
প্লুটো – ১ ”

প্রতিটি গ্রহ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। যদিও এই কক্ষপথের আকার, ঘূর্ণন অক্ষের এবং তলের পরিবর্তন হয় ফলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রদক্ষিণের সময় বদল হয়। উপগ্রহগুলিও তাদের গ্রহগুলির চতুর্দিকে ওইভাবে পরিভ্রমণ করছে। দিন-রাত্রি, ঋতু পরিবর্তন, গ্রহণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি এরই ফলাফল।

প্রত্যেক গ্রহ ও উপগ্রহ সম্পূর্ণ জড় পদার্থ এবং দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় গোলাকার। এর ভর ও আয়তনজনিত মাধ্যাকর্ষণ বল এবং স্থানীয় তড়িৎ চুম্বকীয় বল ছাড়া কোন জীব বা জড়পদার্থের উপর গ্রহের কোনও প্রভাব নেই।

জ্যোতিষের ভাগ্যবিচার

জ্যোতিষশাস্ত্রের রাশিচক্রে যে ২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ আছে, বাস্তবে তার বাইরেও অগণিত নক্ষত্র ও নক্ষত্রগুচ্ছ রয়েছে মহাকাশে। রাশিচক্রের এবং অন্যান্য নক্ষত্রগুলি সূর্য এবং পৃথিবী থেকে এত দূরে অবস্থিত যে তার কোনরকম প্রভাব পৃথিবীতে পড়তে পারে না। সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র হল Proxima Centauri (কিন্নরমন্ডলের নিকটতম তারা) যা সূর্য থেকে ৪ আলোকবর্ষ (অর্থাৎ ৪×৩৬৫.৪×২৪×৬০×৬০ ×৩০০০০০ কিমি) বা প্রায় তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার আটশো সাতচল্লিশ লক্ষ কোটি কিমি দূরে অবস্থিত।

বিপরীতে জ্যোতিষশাস্ত্র কী বলে?

(১) জ্যোতিষশাস্ত্র ২ হাজার বছরের পুরানো অবৈজ্ঞানিক স্থির পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারনার উপর আজও টিঁকে আছে বা বলা যায় জোর করে টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে।

(২) জ্যোতিষশাস্ত্র মতে সূর্য এবং চন্দ্র সহ পৃথিবীর নয়টি গ্রহ আছে। যাদের মধ্যে দুটি হল রাহু এবং কেতু – যাদের কোনও অস্তিত্ব নেই।

(৩) জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে গ্রহগুলির গতি পরিবর্তনশীল। কখনও তারা থেমে যায়, কখনও জোরে চলে, কখনও উল্টো দিকেও যাত্রা করে। এরা নাকি মাঝে মাঝে শয়ন (ঘুমায়) এবং উপবেশন (বসে থাকে) করে!

(৪) বর্তমানে আবিষ্কৃত নবগ্রহ ছাড়াও বৃহস্পতি ও মঙ্গলের মধ্যবর্তী গ্রহাণুপুঞ্জ (অ্যাসটেরয়েড) জ্যোতিষীদের চিন্তাধারায় আজও স্থান পায় নি।

(৫) সৌরজগতের সাময়িক অতিথির (ধুমকেতু ও উল্কা) আগমণকাল জ্যোতিষীদের গণনার বাইরে। জ্যোতিষের গণনায় ধুমকেতু সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যৎবানী নাই।

(৬) জ্যোতিষশাস্ত্রে নক্ষত্রগুলির অবস্থান বিচারের সময় মহাবিশ্বকে দ্বিমাত্রিক (টু ডাইমেনশনাল) বিচার করা হয়। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাবিশ্বকে চতুর্মাত্রিক (ফোর ডাইমেনশনাল) হিসাবে বিচার করে থাকে।

(৭) জ্যোতিষ মতে গ্রহগুলি মানুষ বা অন্য প্রাণীজগতের মত স্বভাব চরিত্র আছে। মঙ্গল যুদ্ধের দেবতা। শনি অমঙ্গল জনক, বিদ্যার দেবতা বুধ, কৃষির দেবতা চন্দ্র এবং দেবরাজ বৃহস্পতি শুভ। শুক্র প্রেমের দেবতা তাই শুভ। সূর্য ন্যায়বিচারের দেবতা তাই কখনও শুভ, কখনও অশুভ। আবার জ্যোতিষ মতে গ্রহগুলির মধ্যে ভয়ানক শত্রুতা বা

বিরুদ্ধ গ্রহ	বিধেয় রত্ন	বর্ণ	রাসায়নিক রূপ
১) সূর্য	মাণিক্য (Ruby) বা চুনী	লাল	লৌহ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Corrundum)
২) চন্দ্র	বৈদুর্য (Cat's eye)	সবুজ, হলুদ	বেরিলিয়ম-অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Crysoberyl)
৩) মঙ্গল	প্রবাল (Coral)	গাঢ় লাল	ক্যালসিয়াম কার্বনেট
৪) বুধ	পদ্মরাগ বা পোখরাজ (Topaz, Yellow Sapphire)	হালকা হলুদ বা স্বচ্ছ	ফ্লুয়োরিন যুক্ত অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট
৫) বৃহস্পতি	মুক্তা (Pearl)	সাদা	ক্যালসিয়ম কার্বনেট
৬) শুক্র	হীরা (Diamond)	স্বচ্ছ	কারবন
৭) শনি	নীলা (Blue sapphire)	নীল	টাইটানিয়ম যুক্ত অ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড (Corrundum)
৮) রাহু	গোমেদ (Garnet)	লাল, কমলা	আয়রন বা অন্য ধাতু যুক্ত অ্যালুমিনিয়ম সিলিকেট
৯) কেতু	পান্না (Emarald)	সবুজ	সামান্য ক্রোমিয়াম যুক্ত বেরিলিয়ম অ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড

মিত্রতাও আছে যেমন –

গ্রহ	মিত্র	শত্রু	সম
রবি	চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি	শুক্র, শনি	বুধ
চন্দ্র	বুধ, রবি	নাই	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি
মঙ্গল	রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি	বুধ	শুক্র, শনি
বুধ	রবি, শুক্র	চন্দ্র	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি
বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	বুধ, শুক্র	শনি
শুক্র	বুধ, শনি	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	বৃহস্পতি
রাহু	শুক্র, শনি	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	বুধ, বৃহস্পতি
কেতু	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	শুক্র, শনি	বুধ, বৃহস্পতি

(৮) জ্যোতিষ মতে গ্রহগুলি স্বক্ষেত্রে রাজত্ব করা ছাড়াও অন্য রাশির দিকে 'দৃষ্টি' দেয়। এই দৃষ্টি আবার পূর্ণ, অর্ধ, তিন চতুর্থাংশ, এক চতুর্থাংশ সবই নাকি হয়! যদিও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহদের 'চোখ' এখনও খুঁজে পান নি!

(৯) জ্যোতিষ মতে গ্রহগুলি বিভিন্ন রাশির অধিপতি যদিও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে রাশির নক্ষত্রগুলি যে কোনও গ্রহ থেকে কোটি কোটি কিমি দূরে অবস্থিত।

(১০) জ্যোতিষের মতে রাহু দ্বারা চন্দ্র-সূর্য গ্রাসে গ্রহণ হয় অথচ বহুদিন আগেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর (বা যে কোনও নক্ষত্র এবং তার গ্রহ ও উপগ্রহের) একই তলে, একই সরলরেখায় আসার ফলেই গ্রহণ হয়।

(১১) জ্যোতিষ মতে রাশিগুলির মধ্যে কেউ চর কেউ কেউ স্থির আবার কেউ 'দ্বত্মক'। এরা কার হয়ে কার বিরুদ্ধে চরবৃত্তি করে থাকে তা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অজানা।

(১২) জ্যোতিষ মতে নক্ষত্ররা কেউ মহিষ, কেউ সিংহ, কেউ গরু, কেউ বাঘ। এর ফলে একে অপরের সাথে এত শত্রুতা।

(১৩) জ্যোতিষ মতে নক্ষত্রগুলির এক একজন অধিপতি আছে। এদের কেউ যম, অগ্নি, ব্রহ্মার মত দেবতা; কেউ সাপের মত প্রাণী, কেউ জলের মত জড়বস্তু আবার কেউ যোনী-র মত শরীরের অঙ্গ।

(১৪) জ্যোতিষ মতে নক্ষত্রেরা কেউ উগ্র, কেউ মৃদু, কেউ তীক্ষ্ণ। এরা আবার কেউ পুরুষ, কেউ নারী, কেউ ঊর্ধ্বমুখ, কেউ অধোমুখ, কেউ পার্শ্বমুখ।

(১৫) জ্যোতিষ মতে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে ভাগ্য নির্ধারণ হয়। এই প্রভাব মানবদেহে বা তার জীবনে কিভাবে পড়ে তার কোনও ব্যাখ্যা নাই। ভৌত-রাসায়নিক-জৈবিক কোনও

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা তাতে নাই। তারা শুধু বলেন কোষ্ঠীবিচার, হস্তরেখা বিচার করে মানুষের অতীত-ভবিষ্যত বলা যায় এবং পাথরের আংটি পড়ে ভাগ্যের পরিবর্তনও করা যায়। এই মত অনুসারে জন্ম মুহূর্তের উপর মানুষের ভাগ্য ঠিক হয়। বর্তমানে পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ জন শিশু জন্ম গ্রহণ করে। তবে এদের সকলেরই তো একই ভাগ্য, একই পেশা, একই অবস্থা, একই মুহূর্তে মৃত্যু হওয়ার কথা! বাস্তব কি বলে?

(১৬) জ্যোতিষ মতে গ্রহ নক্ষত্রের কুপ্রভাবের হাত থেকে বাঁচতে পাথর ধারণ করতে হয়। সেই পাথরগুলি গ্রহ নক্ষত্রের কি প্রভাব (কোন্ শক্তির প্রভাব) কি প্রক্রিয়ায় (মানুষের শরীরে কোন্ বিক্রিয়ায়) খন্ডন করে তা বলা নাই। আসলে জ্যোতিষীদের জানাই নাই এই পাথরগুলির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম কী। মৌলিকভাবে এগুলি সিলিকেট, অ্যালুমিনা বা কার্বনেট যৌগের, যার কোনও রাসায়নিক প্রভাব মানুষের চামড়ার উপর বা শরীরে কোনওভাবেই ফেলে না।

ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের আরও হাজারো দিক তুলে ধরলে যে কোন সাধারণ পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন যে এটা সম্পূর্ণ অবিজ্ঞান এবং ধাপ্পাবাজির উপর প্রতিষ্ঠিত লোক ঠকানো কারবার। এর সাথে বিজ্ঞানের কোনরকম সম্পর্ক নাই।

তবুও অনিশ্চয়তার সংকটে জর্জরিত মানুষ অজ্ঞতার হাত ধরে বাঁচতে চায়। বিগত প্রায় একশ বছর বা তারও বেশী সময় ধরে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠন এবং কর্মীরা এই প্রচার করে আসছেন, তবু তাতে কোনও কাজ হচ্ছে না কেন? কারণ সমাজের বুকে এই অবিজ্ঞান টিঁকে থাকার ভিত্তি হল জীবনের অনিশ্চয়তা। সমাজের অধিপতি তথা শাসকবর্গ চায় মানুষ নিজের এই অবস্থার জন্য নিজের ভাগ্যকে অর্থাৎ নিজেকেই দায়ী করুক। ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য মন্দির-মসজিদে ছুটুক, মাদুলি, তাবিজ, কবজ, আংটি পড়ুক কিন্তু কখনও যেন শোষণমূক শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবসান কল্পে অগ্রসর না হন। তাই সরকারী-বেসরকারী সকল স্তর থেকেই এর প্রচার-প্রসার বাড়ানো হচ্ছে। সিলেবাসে বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান পাশাপাশি ঠাঁই পাচ্ছে। ডাক্তাররা রুগীর পরিবারকে ভাগ্যের ভরসায় চলতে বলছেন। বিজ্ঞানের শিক্ষক-অধ্যাপক-গবেষকরা ভাগ্য বিচার করছেন এবং সেগুলিই ফলাও করে প্রচার হচ্ছে।

তাই শুধু বিজ্ঞানের প্রচার দিয়ে এই সামাজিক ব্যাধি দূর করা যাবে না। সমাজের বুক থেকে তার উৎসকে চিরতরে নির্মূল করতে হবে।

[সূত্র : ১) বিজ্ঞান কিভাবে কাজ করে – চারু প্রভা শিক্ষা সংসদ ২) বিজ্ঞানের আলোয় জ্যোতিষ – ডা: পার্থ সারথী গুপ্ত]

সংগঠন সংবাদ

মে দিবসের অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক

গত ১লা মে, ২০১৩ লাল ঝান্ডা মজদুর ইউনিয়নের আমন্ত্রণে, বিজ্ঞানমনস্ক'র প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুব সম্প্রদায়ের মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সংগঠন মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিনিধিও সংগঠনের বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন – বিজ্ঞান চর্চা সমাজ বহির্ভূত কোনও বিষয় নয়। বর্তমান সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে কিন্তু এই উন্নতির পিছনে যাদের সবচেয়ে বেশী অবদান রয়েছে সেই মেহনতী মানুষরা বিজ্ঞানের সুফল হতে বঞ্চিত। বর্তমান সমাজে বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকরা বিজ্ঞানকে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে। সেই পণ্য ক্রয় করতে পারে যাদের ক্রয় ক্ষমতা আছে কেবল মাত্র তারাই। অথচ বর্তমান আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাসমান। মানুষের দুঃখ দুর্দশা অভাব যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই ঈশ্বরবাদ, অদৃষ্টবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে মানুষ। তিনি বলেন, শুধুমাত্র কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করলে কুসংস্কার দূর হবে না বরং কুসংস্কার টিকে থাকার আর্থ সামাজিক শর্তগুলিকে দূর করা দরকার। বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ঠিকই তবে তা সামাজিক আন্দোলনের অধীনেই থাকতে হবে। এই কাজটি মে দিবসের ডাকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ■

গল্প নয় সত্যি

কেরালার আদিবাসী অঞ্চলের একটি করুণ কাহিনী

কেরালা রাজ্যের আত্তাপাদ্দি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কুরুম্ভু গোষ্ঠী হল সবচেয়ে প্রাচীন জনজাতি। কেরালা-তামিলনাড়ু সীমান্ত অঞ্চলে আত্তাপাদ্দি গোষ্ঠীর আদিবাসীরা থাকে সেখানকার অতি ক্ষুদ্র ১৯টি পাহাড়ী গ্রামে। ২০১১-১২'র জনগণনা অনুসারে আত্তাপাদ্দি ব্লক পঞ্চায়েতের বার্ষিক প্রোজেক্ট রিভিউ থেকে দেখা যায় যে এই অঞ্চলে এইরকম ১৮৩টি অতিক্ষুদ্র গ্রাম আছে যার মধ্যে ১৯টি-তে কুরুম্ভু গোষ্ঠীর আদিবাসীরা থাকেন। এই অঞ্চলের মোট তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পুদুর পঞ্চায়েতে ৫৫৩ জন এবং শোলাউর পঞ্চায়েতে ২৪ জন কুরুম্ভু গোষ্ঠীর মানুষ বাস করেন।

এদাভানি অরু হল এমনি একটি অতিক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের কারও অসুখ হওয়া মানা। অসুখ হলে তাদের যেতে হয় ১৬ কিমি দূরবর্তী পুদুর প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে। যাবেন কিভাবে? গাড়ি চলা তো দূরে থাক, ভালমত পায়ে হাঁটার কোনও রাস্তাও নেই। বাচ্চাদের অসুখ হলে মূলি বাঁশ কেটে দোলনা বানানো হয়। পাথুরে পথে (যেখানে যখন তখন পাথরের চাঁই ভেঙে পড়ছে) সহজাত প্রবৃত্তিকে ভরসা করে ওই বাঁশের ডান্ডায় বাঁধা দোলনায় অসুস্থদের নিয়ে যাওয়া হয়। সামনে যে বাঁশ ধরে সে চিল চিৎকার করে আর পেছনের সঙ্গীরা সেই তাল মেনে এগিয়ে চলে। এ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করে টিভি-র পর্দায় দেখালে মনে হবে অন্ততঃ হাজার বছর আগেকার কোনও প্রাচীন মানুষের দল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছেন! শুকনোর সময় যাও বা এভাবে যাওয়া যায়, বর্ষায় তা হয়ে পড়ে অসম্ভব। পাহাড়ী পথ হয়ে পড়ে দুর্গম আর ভরাগর নদী ভরে গেলে এদাভানি অরু'র মত গ্রামগুলি হয়ে পড়ে বাকী অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত।

যদিও বা দোলনা করে অসুস্থ শিশুটিকে জীবিত অবস্থায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনা হল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুটিকে চানথাকাদা'র কোট্টাথারা ট্রাইবাল স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। কারণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জ্বর বা ডাইরিয়ার বড়ি ছাড়া কিছুই মেলে না। এই কোট্টাথারা হাসপাতাল পুদুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে ৯ কিমি দূরে। ওখানে যাওয়ার বাস প্রায় পাওয়াই যায় না। পাওয়া যায় জীপ, যার অনেক ভাড়া। তাই শিশুটিকে দোলনায় চড়িয়ে আবার শুরু হয় হাঁটা।

আইনে আদিবাসীদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধার কথা বলা থাকলেও হাসপাতালে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা ছাড়া বিশেষ কিছুই জোটে না। গত ১৬ই এপ্রিল কোট্টাথারা হাসপাতালে স্থানীয় যুবক নাগানের সাত মাসের অন্তস্বত্তা স্ত্রী মীনাক্ষী ভর্তি হতে যায়। ডাক্তারবাবুরা তাকে ভর্তি না করে ছেড়ে দেয়। দুর্গম পথ ধরে ফিরে আসার সময় মীনাক্ষীর আবার ব্যাথা ওঠে। তাই তাকে আবার হাসপাতালে নিয়ে যায় নাগান। মীনাক্ষী একটি মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করে। ১৩দিন হাসপাতালে থেকেও মীনাক্ষী সুস্থ হয় না। ২৮শে এপ্রিল নাগান হাসপাতালের কর্মীদের একটি গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলে, অন্তত পুদুর অবধি যাবে বলে। তাকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। এই ঘটনার পর মীনাক্ষীর সাথে নাগানের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। সে এখন অসুস্থ অবস্থায় বাপের বাড়ি থাকে ভূদাউর গ্রামে, পুদুর থেকে ১১ কিমি দূরে। কারও সাথে কথা বলে না।

এদাভানি অরু গ্রামের অন্য একটি মেয়ের নাম বিন্দু। সেটা ছিল ২০১০ সালের জুলাই মাস। বিন্দুর ছেলে বিনোদ তখন ৮ মাসের। বেশ কয়েক দিন ধরে তার প্রবল জ্বর। ভারাগর নদীতে তখন প্লাবন। অরু গ্রাম বিচ্ছিন্ন। বাচ্চার মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। বাপ কাকারা প্রবল চেষ্টা করেও দোলনায় শোয়ানো বাচ্চাটাকে নদী পাড় করতে পারেনি। ওরা সকলে মিলে তাদের একমাত্র 'ভরসা' ঈশ্বরকে ডেকেছেন। তিনি ওদের কথা শোনেন নি। দোলনার মধ্যেই নেতিয়ে পড়েছে বিনোদ। আর কোনদিন কাঁদে নি।

বিন্দু আবার মা হয়েছে। দু মাসের মেয়েকে সে আর ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে দেবে না। যতই অসুখ করুক। আর তার ভরসা নেই হাসপাতালের প্রতি।

অরু গ্রামের শিক্ষিত ছেলে লিংগান মালান। লেখাপড়া শিখলেও শিক্ষিত মানুষ আর উন্নত সভ্যতার উপর তার খুব রাগ। সাংবাদিককে দেখেই সে বলল "আমি দেখেছি, খবরের কাগজে লিখেছে আদিবাসীরা নাকি হাসপাতালে যেতে ইচ্ছুক নয়। এর কারণ কী? আমরা হাসপাতালে যাই। ওরা আমাদের জ্বরের ট্যাবলেট দেয়। যদি ওষুধ কোট্টাথারা হাসপাতালে না পাওয়া যায় তবে আমাদের তা কিনে আনতে হয়। ... আমাদের

সব সময় মেডিকেল কলেজে রেফার করে দেয়। শেষমেশ আমরা ঘরে ফিরি বিধ্বস্ত হয়ে। তাই হাসপাতালে যেতে আতঙ্ক বোধ করি।"

লিংগান আবার বলে "অনেক আগে এদাভানি অরু-তে 'পাঞ্জা কৃষি' (জঙ্গলের মধ্যে ৫ রকম ফসল চাষ) ব্যবস্থা ছিল। এরপর মানুষ গাঁজা চাষ শুরু করে। ফরেস্ট অফিসাররা এসে গাঁজা চাষ, পাঞ্জা কৃষি সব ধ্বংস করে দিল। এখন আমরা জঙ্গলে চাষ করতে ভয় পাই। ফরেস্ট অফিসাররা বলে আমরা মদ তৈরী করি, আমরা খারাপ। কিন্তু আমাদের অন্য জীবন দাও। আমাদের রাস্তা দাও। যাতে করে অন্তত আমরা আমাদের বাচ্চাগুলোকে বাঁচাতে পারি।"

এদাভানি অরু গ্রামে যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই, পানীয় জলের সরবরাহ নেই, বিদ্যুৎ নেই। ল্যামপোস্টের গায়ে ভাঙা সোলার লাইটগুলো সবই প্রতিকী। ১০ বছর আগে পুদুর পঞ্চায়েত থেকে জল সরবরাহ করার জন্য পাইপ আনা হয়েছিল। সেগুলি গ্রামেই পড়ে আছে, কোনদিন ব্যবহার হয় নি। গৃহহীনদের আবাস গড়ার 'ই এম এস ভবনা নির্মাণা পদাথি' প্রকল্পে গ্রামে ২৩টি ঘর তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়। এর মধ্যে ১০টি তৈরী হয়েছে। বাকীগুলি অর্ধেক বা সিকিভাগ বানিয়ে ফেলে রাখা আছে।

পুদুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে একজন নার্স মাসে একবার অরু গ্রামে যান জ্বরের বড়ি বিলি করতে। অধিকাংশ শিশু গ্রামেই দাই মা'র হাতে জন্মায়।

চার লক্ষ টাকা ব্যয়ের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র অরু গ্রামে হওয়ার কথা ছিল। রাস্তা না থাকায় তা আজও গড়ে ওঠেনি।

আদিবাসী এবং বনাঞ্চলে থাকা মানুষদের বনাঞ্চলের উপর "গোষ্ঠীগত অধিকার" (কমিউনিটি রাইটস) আজও খাতায় কলমে রয়ে গেছে, পৃথিবীর আলো দেখেনি।

সরকারী হিসাবে তবুও অরু গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ সমাপ্ত। তাই গ্রামবাসীকে সপ্তাহে হাফ লিটারের বেশী কেরোসিন দেওয়া হয় না।

গ্রামের অর্ধেক মানুষ সরকারী খাতায় এপিএল (দারিদ্র সীমার উপরে) এবং তাদের ঘরে নাকি বিদ্যুৎ সংযোগ আছে! অথচ গোটা অরু গ্রামে আজও বিদ্যুৎ পৌঁছায় নি।

এদাভানি অরু শুধু নয়, ভারতের কোণে কোণে এই ছবি দেখতে দূরবীনের দরকার পরে না। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, তরাই, ডুয়ার্স, পাহাড় শুধু নয় রাজধানী কলকাতার ১০০ কিমি ব্যাসার্ধেই প্রচুর গ্রামে প্রায় একই ছবি দেখা যায়। শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এ ছবি পাল্টে দিতে পারবে না। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এই কাহিনীর বদল ঘটবে না।

[তথ্যসূত্র ঃ দূ হিন্দু ৫ই মে ২০১৩]

ফিলিপাইনস্-এ ম্যায়ন আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে ৫ জনের মৃত্যু ঘটাল

ফিলিপাইনস-এর রাজধানী ম্যানিলা থেকে ৩৪০ কিমি দক্ষিণপূর্বে সেদেশের সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ম্যায়ন আবার জেগে উঠল গত ৭ই মে ২০১৩। এই ম্যায়ন আগ্নেয়গিরি থেকে প্রচুর পাথরকুচি, ছাই, ধুলো এবং গরম বাষ্প নির্গত হয়। অগ্নুৎপাতের কোন পূর্বাভাস না থাকায় সেই সময় ম্যায়ন পাহাড়ে দুটি দল পাহাড়ে অভিযান করছিল। রাতে ওই পাহাড়ে বসবাসের পর ৩০ জনের অভিযাত্রীরা হঠাৎ অনুভব করেন যে পাহাড়টি দুলছে। এরপর শুরু হয় পাথর বৃষ্টি এবং ধোঁয়ার কুন্ডলীর উঠে আসা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শুরু হওয়া এই অগ্নুৎপাতে ৫ জন অভিযাত্রী মারা গেছেন এবং বেশ কয়েকজন আহত। হেলিকপ্টারের সাহায্যে অভিযাত্রীদের উদ্ধার করা হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয়গিরি বলয়ের ম্যায়ন আগ্নেয়গিরি গত ৪০০ বছরের ইতিহাসে মোট ৪০ বার অগ্নুৎপাত ঘটিয়েছে। অগ্নুৎপাত জনিত আগ্নেয়শিলা দ্বারা গঠিত ২৪৬০ মিটার উচ্চতার এই আগ্নেয়পর্বত থেকে ২০১০ সালের শেষ অগ্নুৎপাতের সময় আশপাশের মানুষকে সরিয়ে আনা হয়। সেই সময় ওই আগ্নেয় পাহাড় থেকে প্রায় ৮ কিমি উচ্চতায় পাথর, ধুলো, গরম জল এবং লাভা উঠে এসেছিল।

ফিলিপাইনস এর এই আগ্নেয়গিরিটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় টেকটনিক প্লেটের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিকভাবে এটি একটি কনভারজেন্ট প্লেট সীমান্ত, যেখানে সামুদ্রিক প্যাসিফিক (প্রশান্ত মহাসাগরীয়) প্লেট অতিক্ষুদ্র ফিলিপাইনস (সামুদ্রিক) প্লেটের অভ্যন্তরে নেমে যাচ্ছে (সাবডাকশন)। এই প্লেট সীমান্ত বরাবর একটি গিরিখাত (ট্রেঞ্চ) আছে। আগ্নেয়গিরিগুলি

● *পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান!
পচা-গলা সমাজ বদল ছাড়া তা সম্ভব নয়!

আমরা যারা নিজেদের সচেতন ও বিজ্ঞান মনস্ক বলে দাবি করি এবং সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে কাজ করি, তাদের আজ ভাবার সময় এসেছে। এদেশে বিগত একশ বছরেরও বেশী সময় ধরে কুসংস্কার বিরোধী কর্মকান্ড হয়েছে, নানা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি গড়ে উঠেছে কিন্তু ব্যাপক শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে তা দূর হয়নি উল্টে তাদের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার গভীরে বাসা বেঁধেছে। সারা দেশের তিনটি কোণার তিনটি ঘটনা আবার তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। এইসব কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের উৎস এই অচল হয়ে পড়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। তাই কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনকে বাস্তব রূপদান করতে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের সাথে হাতে হাত মেলাতে হবে প্রতিটি বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকে। এখন আসুন দেশের তিনটি কোণে অতি সম্প্রতি ঘটা তিনটি টুকরো ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করি।

ক) পুরোহিত মহিলাদের উপর দিয়ে মাড়িয়ে গেলে তা শুভ!

তামিলনাড়ু রাজ্যের কোয়েমবাটুর শহরের নিকটবর্তী মাদাতুর গ্রামে হাজার হাজার বছরের এক পুরানো কুসংস্কারের শিকার সাধারণ মানুষ। গ্রামের সাধারণ মানুষ জমা হন ওই মন্দিরে। শত শত পুণ্যলোভী মহিলা পরিবারের উন্নতির জন্য মন্দিরের সংলগ্ন উঠোনে শুয়ে আছেন আর বিশাল বপু প্রধান পুরোহিত ঘড়া হাতে জল ছেটাতে ছেটাতে মহিলাদের মাড়িয়ে যাচ্ছেন, এ দৃশ্য মাঝে মধ্যেই দেখা যায়। এতে নাকি পূণ্য লাভ হয়! পিছিয়ে পড়া গ্রামবাসীদের যুগ যুগ ধরে শেখানো হচ্ছে যে এই আচার তাদের জন্য অতীব শুভ।

●৩৭পৃষ্ঠার পর

ফিলিপাইনস্-এ ম্যায়ন আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে ৫ জনের মৃত্যু

(আইল্যান্ড আর্ক) ওই গিরিখাতের প্রায় সমান্তরালে আছে। এর উত্তর পশ্চিম দিকে আছে মহাদেশীয় ইউরেশিয়ান প্লেটে।

ভূতাত্ত্বিকভাবে এই অঞ্চল অগ্নুৎপাত ও ভূমিকম্পের জন্য প্রসিদ্ধ। প্লেটগুলি সঞ্চরণের হার সামান্য কম বেশী হলেই এবং এর জন্য চ্যুতি ঘটলেই এই অঞ্চলে ভূমিকম্প হয় এবং মাঝে মাঝে হয় অগ্নুৎপাত। ফিলিপাইনস, জাপান ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জগুলি সবই এই অগ্নুৎপাতের কারণে সৃষ্ট। এই আগ্নেয়গিরিগুলি যেহেতু একসারিতে একটি বৃত্তচাপের মত অবস্থান করে সেই কারণে তাদের আইল্যান্ড আর্ক বলে। বিগত প্রায় ৫-৬ কোটি বছর ধরে প্লেট সঞ্চরণ (সাবডাকশন প্রক্রিয়া) চলছে এবং সমগ্র এলাকার ভূতাত্ত্বিক গঠন এর সাথে সম্পর্কিত।

ভূতাত্ত্বিকভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ অশান্ত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও, ম্যায়ন আগ্নেয়গিরি বিগত দিনে এত সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও বিনা প্রস্তুতিতে এখানে অভিযাত্রীরা কেন গিয়েছিল এবং সঠিক পূর্বাভাস দিয়ে তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা কেন করা হল না এটাই বিজ্ঞানী মহলের প্রশ্ন। [সূত্র ঃ দ্য হিন্দু ৮ই মে ২০১৩]

শত শত নারী শরীরকে পাপোশ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এই ভারতে, যা নাকি ২০২০ সালে বিশ্বের সর্বাধুনিক রাষ্ট্র হবে! প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞান কংগ্রেসে এই ঘোষণা করেছেন। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই হীন, অমানবিক অত্যাচার আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক দল আজও পদক্ষেপ নেয়নি। সম্প্রতি কিছু বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এবং নারী-অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রামরত মানুষ এর প্রতিবাদে সরব হয়েছে। (সূত্র ঃ এই সময় ১৯শে মে ২০১৩)

খ) 'ভূত ধরা মেয়ের ভূত তাড়াতে' তাকে পুড়িয়ে দিল ওঝা!

পশ্চিমবঙ্গ নাকি কুসংস্কারমুক্ত! এ রাজ্যের মানুষ নাকি বিজ্ঞান সচেতন! এই প্রচার যে সর্বৈব মিথ্যা তা আরও একবার প্রমাণ হল নদীয়া জেলার চাপড়া থানার মালুমগাছা গ্রামে। ওই গ্রামের মানুষ শম্ভুবাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন। তারপর থেকেই নাকি প্রবল মাথা ও বুকের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল সন্দীপা। হয়ত এই বিবাহের পরিণতি নিয়ে সে আতঙ্কিত ছিল কিন্তু কাউকে বলতে পারে নি। হাতুড়ে ডাক্তার দেখিয়ে কোনও কাজ হয় নি। মাছ ব্যবসায়ী শম্ভুবাবুকে পড়শীরা। পরামর্শ দেন 'মেয়েকে ভূতে ধরেছে। ওঝা ডাকো।' গত ১৪ই মে কোন দ্বিধা না করে কালীপদ ওঝাকে ডাকা হল। ওঝা এলেন, রোগী পরীক্ষা করে বললেন ওকে ভূতে ধরেছে, ঝাড় ফুক করতে হবে। প্রথমে ইচ্ছামত চড় থাপ্পড় আর তারপর উঠোনে গন্ডি কেটে মড়ার খুলি বসিয়ে আগুন জ্বালানো হল। কেরোসিন ঢেলে আগুণ জ্বালানো হল। বেঁধে রাখা সন্দীপার শরীর ওই লকলকিয়ে ওঠা অগ্নিশিখায় ঝলসে যায়। তারা সারা গা ও চুলে আগুন ধরে যায়। চিৎকার করে বাঁচানোর আর্তি জানাতে থাকে মেয়ে। শম্ভুবাবু আর তাঁর স্ত্রী ভারতীদেবী আর সহ্য করতে না পেরে ছুটে গিয়ে বাঁধন খুলে দিতে চান। বাপ-মা'কে আটকে দেয় কালীপদ। সে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলে "আগুন ভূতের গায়ে লেগেছে। মেয়ের গায়ে নয়। আগুনেই তো ভূত নামবে।" কালীপদ'র এই হুঙ্কারে নীরব দর্শক হয়ে যান বাবা-মা এবং পড়শীরা। ঝলসে যাওয়া মেয়ে আরও প্রবল চিৎকার করতে থাকে। মা-বাবা ক্রমশ উতলা হয়ে পড়ায় কালীপদ এবার "মন্ত্রপূত সরষের তেল" আগুনে ঢেলে বলে "এতেই ভূতের গায়ের আগুন নিভবে।" আরও লেলিহান শিখায় আগুন জ্বলে ওঠে। পোড়া মেয়ের শরীর আর যেন চেনা যাচ্ছে না। সে নেতিয়ে পড়তে থাকে।

এবার বোধোদয় হয় শম্ভু আর ভারতী'র। পড়শীদের নিয়ে মেয়েকে সরিয়ে নিয়ে আগুন নেভান তারা। তারপর ছুট দেন হাসপাতালে। ঊর্ধাংশ জ্বলে গিয়ে সন্দীপা এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। আর শোকে-দুঃখে-চিন্তায় পাগল হয়ে গেছেন মা-বাবা।

বেগতিক দেখে দলবল সহ চম্পট দিয়েছে কালীপদ ওঝা। শম্ভুবাবু তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন। এই রিপোর্ট রচনাকাল পর্যন্ত তাকে গ্রেফতারের কোনও খবর নেই।

এই ঘটনার পর পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের নদীয়া জেলার সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় সংবাদ সংস্থাকে বলেন, 'কিছু মানুষের অজ্ঞতায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। প্রথম থেকেই সন্দীপার চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। কাউন্সেলিংও করানো যেতে পারত।"

এই ঘটনাটিকে কি শুধুমাত্র কিছু মানুষের অজ্ঞতা বলবেন। দেশের সর্বত্র বারবার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের জীবনে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন তার দায় কি কিছু সংস্কারে আবদ্ধ মানুষেরই শুধু? সমাজের পরিচালকবর্গ-প্রশাসনের কি কোনও দায় নেই? জ্যোতিষ, গুণীন, ওঝা, বদ্যি, গুরুকূল তো সমাজে বহাল তবিয়তে, আইনীভাবে, রীতিমত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, চ্যানেল খুলে টিঁকে আছে। আজ পর্যন্ত দেশের কেন্দ্র বা কোন রাজ্য সরকার এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে? কোনও সংসদীয় রাজনৈতিক দল কোনও ভূমিকা নিয়েছে? নেয় নি। তারা তা নেবেও না। কারণ সমাজে এই অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার বাসা বেঁধে থাকলে তাদেরই সুবিধা। তাতে শোষণের আর অসাম্যের ব্যবস্থা টিঁকে থাকার রাস্তা পরিষ্কার হয়।

[সূত্র ঃ এই সময় ৩০শে মে ২০১৩]

গ) ত্রিপুরায় ডাইনী অপবাদে জোড়া খুন

গত ৫ই মার্চ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মনুবাজারের নিকটবর্তী ছোট শাকবাড়ি অঞ্চলে ডাইনী সন্দেহে এক বৃদ্ধা ও তার মেয়েকে হত্যা করা হয়। ঘটনার যথাযথ অনুসন্ধানের জন্য ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ'র পক্ষ থেকে ৮ই মার্চ ৫ সদস্যের একটি টিম ঘটনাস্থলে যায়।

এলাকাটি সম্পূর্ণ টিলাভূমি, অনেকগুলি টিলার উপর ছড়ানো ছিটানো কিছু গ্রাম। আগে এখানে ৯৭টি পরিবার থাকত। ফরেস্ট থেকে পাট্টা বিলির ফলে অনেক পরিবার মেইন রোডের কাছাকাছি চলে এসেছে। এখন মাত্র ৩টি

পরিবার থাকে। এদের জীবিকা হল – টিলার লুঙ্গায় করা অল্পবিস্তর ধান চাষ, জুম চাষ আর রবার বাগানে মজুরি। চিকিৎসার সুযোগ বলতে চার কিমি দূরের কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এলাকার পানীয় জলের একমাত্র উৎস হচ্ছে লুঙ্গা জমিতে টিলার গা ঘেঁষে করা হাত দুয়েকে গর্তে জমা নোংরা জল। বাসিন্দারা সবাই জনজাতি ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষ। এলাকার সর্দার ('রোয়াজা') শ্যামাচরণ ত্রিপুরার স্ত্রী আজংমালা ত্রিপুরা (৬৫) এবং মেয়ে পুষ্পমালা ত্রিপুরাকে (৩৬) ডাইনী সন্দেহে হত্যা করা হয় নৃশংসভাবে।

শ্যামাচরণের খুড়তুতো ভাই রমনীর বিষয় সম্পত্তি কিছুটা কম। ২-৩ মাস আগে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে শ্যামাচরণ-রমণীর ঝামেলা হয়। বৃদ্ধ রমণী দীর্ঘদিন নানা পেটের অসুখে ভুগছেন। হাসপাতালে চিকিৎসার সামর্থ্য নেই। নানাপ্রকার লতাপাতাই ভরসা। রমণী মোহনের বাবা নয়নকুমার ত্রিপুরা গ্রামের উচাই বা গোষ্ঠী নেতা। তিনি ছেলের অসুখের জন্য আজংমালাকে সন্দেহ করেন। ঘটনার ১৫ দিন আগে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ধনুমোহন ত্রিপুরার উপস্থিতিতে এ নিয়ে আদিবাসী সমাজের বিচার হয়। বিচারে রায় হয় আজংমালাকে ১০ দিনের মধ্যে রমণীকে সুস্থ করে দিতে হবে, নইলে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। কার্যত অসম্ভব এই রায়ে আজংমালার পরিবার নিরুপায় হয়ে গ্রাম ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১০ দিনও কাটেনি, ৮ দিনের মাথায় রমণী ত্রিপুরার ৩ ছেলে আজংমালার উপর চড়াও হয়। রাত তখন ৯টা। শ্যামাচরণ বাড়িতে ছিলেন না। প্রথমে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তার মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়। বিষক্রিয়া শুরু না হওয়ায় মোটা বাঁশের হুঁকো দিয়ে মারা চলতে থাকে। চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে মেয়ে পুষ্পমালা মাকে বাঁচাতে ছুটে আসে। নৃশংসভাবে মা-মেয়েকে মেরে ফেলা হয়। চিৎকার শুনেও প্রতিবেশীরা কেউ এগিয়ে আসেনি। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী রাতে গ্রামে পুলিশ গেলে ৭-৮ জন মহিলা নাকি দারোগাকে ঘেরাও করে রাখে এবং হত্যাকারীদের পালাতে সাহায্য করে। পুষ্পমালা বাবার পাশের ভিটেতে থাকত। তাঁর সন্তানকে তাদের ঘরে আটকে রেখেই এই হত্যাকান্ড চলে। তাদের এত হুমকী দেওয়া হয় যে তারা আতঙ্কে প্রথমে পুলিশকে সাক্ষ্য পর্যন্ত দেয়নি। ঘটনার ২ দিন পর পুলিশ তাদের সাক্ষ্য আদায় করে।

ঘটনার পর রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনিক মহল ডাইনী অপবাদে হত্যার ঘটনায় এলাকাবাসীর অজ্ঞতা-নিরক্ষরতা এবং অন্ধ বিশ্বাসকে দায়ী করে নিজেদের দায় এড়িয়েছেন। কারণ পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং আধুনিক চিকিৎসা যাদের নাগালের বাইরে তারা স্বাস্থ্যের জন্য উচাই, গুণীনদের পরামর্শ নেবেন এটাই স্বাভাবিক। মাথা চাড়া দেয় আদিম বিশ্বাস। যেখানে সমাজটা টিঁকে আছে এখনও আদিম অবস্থায় সেখানে মানুষের চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাস আধুনিক হতে পারে না। ডাইনীর শেকড় গাড়া আছে এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই।

[সূত্র ঃ ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চের মুখপত্র
'অন্বেষণে' পত্রিকা'র এপ্রিল ২০১৩ সংখ্যা]

এশিয়া ও ইউরোপের মূল ভূখন্ডের অধিবাসীদের ভাষা ১৫ হাজার বছর আগে একই ছিল

ব্রিটেনে রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী মার্ক প্যাগেল গার্ডিয়ান পত্রিকাকে জানিয়েছেন যে ইউরেশিয়া ভূখন্ডের (ইউরোপ এবং এশিয়াজুড়ে বিস্তৃত ভূখন্ড) বর্তমানে বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের পূর্বপুরুষ আজ থেকে প্রায় ১৫ হাজার বছর আগে অর্থাৎ শেষ বরফযুগের একদম শেষ পর্যায় একই বায়োলজিক্যাল সুপারফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সুপারফ্যামিলির মানুষ তখন দক্ষিণ ইউরোপে বসবাস করত এবং তাদের মুখনিসৃত ভাষা বিবর্তনের পথ ধরে ইউরোপের ইংরাজী, পর্তুগালী, রুশী, জার্মান ইত্যাদি হাজারো ভাষার যেমন জন্ম হয়েছে তেমনই ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি এশিয়াবাসীর নানা ভাষারও জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ ১৫ হাজার বছর ধরে ইউরেশিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষের নানা ভাষার জন্ম হয়েছে একই পূর্বপুরুষ (সুপারফ্যামিলি) থেকে। ইউরেশিয়াবাসীর বিভিন্ন ভাষাগুলির (শব্দগুলির) বিবর্তনের ইতিহাস ঘাঁটলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

ভাষার এই বিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে আজও নানা বিতর্ক রয়েছে। কারণ বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের ব্যবহৃত কিছু শব্দ দ্রুত বিবর্তিত হয় আবার অনেক শব্দের বিবর্তন হয়

ধীর গতিতে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মানুষ ব্যবহৃত শব্দের প্রায় ৫০ শতাংশ দুই হাজার থেকে চার হাজার বছরের মধ্যে একেবারে সম্পর্কহীন শব্দে বদলে যেতে পারে। কিন্তু বহু শব্দের বিবর্তনের জন্য অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন।

রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্ক প্যাগেল এবং তার গবেষকদল জানিয়েছেন যে বহু শব্দ, যেমন কিছু সর্বনাম, সংখ্যা এবং অব্যয় অন্য শব্দ দ্বারা বিবর্তিত হতে বহু সময় নেয়। ইউরেশিয়া অঞ্চলের মানুষের ব্যবহৃত নানা শব্দ এবং তাদের মধ্যে একই অর্থ বহনকারী সমধরণের শব্দগুলিকে কম্পিউটার মডেলিং করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্যাগেল নিশ্চিত হয়েছেন যে আজ যে শব্দগুলি সমধরণের বা প্রায় সম উচ্চারণ বিশিষ্ট সেগুলি অতীতে একই শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।

ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের বিজ্ঞানীরা তাদের প্রকাশিত রচনায় দেখিয়েছেন যে ইউরেশিয় অঞ্চলে ব্যবহৃত ২৩টি শব্দ পাওয়া গেছে যেগুলি অতীতে একই শব্দ থেকে বিবর্তিত এবং প্রাচীন সুপারফ্যামিলি দ্বারা উচ্চারিত। 'আমি', 'আমরা' ইত্যাদি সর্বনাম এবং 'মা', 'মানুষ' ইত্যাদি বিশেষ্যগুলি এদের অন্যতম। ক্রিয়াপদের মধ্যে 'থুতু ফেলা (to spit), 'দেওয়া' (to give) বিবর্তিত হয়েছে বহু সময় ধরে এবং ইউরেশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এর আদি শব্দগুলি বহু সময় ধরে ব্যবহার করেছেন। প্যাগেলের মতে 'দেওয়া' শব্দটি ইউরেশিয়ার পাঁচটি অঞ্চলে বহুদিন একইভাবে উচ্চারিত হত।

'Bark' (গাছের ছাল) এবং 'Worm' (কেঁচো জাতীয় প্রাণী) শব্দ দুটিও বিজ্ঞানী প্যাগেলের মতে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্যাগেল মন্তব্য করেছেন যে "Bark বা গাছের ছালকে প্রাচীন মানুষ ব্যবহার করত শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, আগুন জ্বালিয়ে খাদ্য পুড়িয়ে খেতে এবং তার থেকে ফাইবার বা আঁশ বার করে পোশাক বানানোর জন্য।"

বিভিন্ন অনুসন্ধান থেকে ব্রিটেনের বিজ্ঞানীরা সহমত হয়েছেন যে আজ থেকে ১৫ হাজার বছর আগে, একই ধরণের জিহ্বা বিশিষ্ট ইউরেশীয়বাসী একই সুপার ফ্যামিলির অন্তর্গত ছিল এবং তাদের আদিভাষা একই ছিল। পরবর্তী ৫ হাজার বছরে এই সুপার ফ্যামিলি ৭টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে পৃথক পৃথক বায়োলজিক্যাল ফ্যামিলিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আলাদা আলাদা ভৌগোলিক পরিবেশে, আলাদা আলাদা প্রকৃতিতে পরিবেশের সাথে চলতে গিয়ে তাদের খাদ্যাভ্যাস বদলেছে, ফলে জিহ্বা, দাঁতের গঠন এবং তাদের ভাষাও পরে আলাদা হয়ে গেছে। আদিম শ্রেণীহীন মানব সমাজ এরপর শ্রেণীবিভক্ত ও 'সভ্য' সমাজ গড়ে তুলেছে। সেই শ্রেণীবিভক্ত সভ্য সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সূচনা ও তার বিকাশ ভাষা ও তার শব্দাবলীর বিকাশ ঘটিয়েছে প্রকৃতি নির্ভর মানব সমাজ থেকে অনেক দ্রুত গতিতে। আলাদা আলাদা ভৌগোলিক পরিবেশ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত মানুষের ভাষা তাই পৃথক হয়ে পড়েছে সময়ের সাথে সাথে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা আরও একবার প্রমাণ করল বিবর্তনবাদের সত্যতাকে। এই গবেষণা আরও প্রমাণ করল যে আজকের বর্ণ-ধর্ম-জাতি তথা শ্রেণীতে বিভক্ত মানব সমাজের পূর্বপুরুষ একই। এই বিজ্ঞান সমাজের বর্তমান অধিপতি তথা রাষ্ট্রগুলির শাসকশ্রেণীর অজানা নয়। তারা এই সত্য জেনেও দেশে দেশে মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-জাতের লড়াইয়ে নামিয়ে দেয়, সমগ্র মানব সমাজের প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

[তথ্যসূত্র ঃ দ্য হিন্দু ৮ই মে ২০১৩]

ইতিমধ্যে অনেক পাঠক টেলিফোনে সমীক্ষণ সম্বন্ধে তাঁদের মূল্যবান মতামত জানিয়েছেন। যে পাঠকরা টেলিফোনে মতামত জানাচ্ছেন তাঁদের জানানো হচ্ছে, আপনারা ডাকযোগে অথবা ই-মেলে আপনাদের মতামত পাঠান যাতে আপনাদের মতামত পত্রিকায় প্রকাশের সুযোগ থাকে। এতে পত্রিকার সকল পাঠকই উপকৃত হবেন।

– সম্পাদক, সমীক্ষণ

সংগঠন সংবাদ

সোনারপুরে বিজ্ঞান মনস্ক'র সেমিনার

গত ৭ই এপ্রিল সোনারপুর শিশুনিকেতন স্কুলে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক সমস্যা'। আলোচনা ছাড়াও ঐ অনুষ্ঠানে অন্যান্য যে কর্মসূচী ছিল তা হল স্থানীয় স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক মডেল প্রদর্শনী, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও নাটক।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অনুষ্ঠান শুরু হয় বৈকাল তিন ঘটিকায়। মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর শুরু হয় মডেল প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় যে সকল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে তাহল সেন্ট স্টিফেন্স স্কুল, জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল, ঘাসিয়াড়া হাইস্কুল। প্রায় ৩০-৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী তাদের মডেল মঞ্চে উপস্থাপনা করে। এর মধ্যে কয়েকটি উপস্থাপনা প্রশংসার দাবী রাখে। প্রেক্ষাগৃহে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন। স্কুল প্রতিনিধিদের হাতে স্মারক প্রদানের মধ্য দিয়ে এই পর্বের অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এরপর শুরু হয় সেমিনার 'ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক সমস্যা ও তার প্রতিকার'। তিনজন আলোচক এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার মূল যে বিষয়গুলি উঠে আসে তা হল – আর্সেনিক দূষণ মনুষ্য জনিত নয়। ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক সঞ্চয় একটি প্রাকৃতিক ঘটনা তাই একে দূষণ বলা ঠিক নয়। আলোচকরা ব্যাখ্যা করেন কিভাবে যুগের পর যুগ ধরে হিমালয়ে সঞ্চিত আর্সেনিকের খনিজ হতে জলধারায় ধৌত হয়ে আর্সেনিক ভূসলিলাধারে সঞ্চিত হয় এবং পানীয় জলে আর্সেনিক সমস্যা সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে পানীয় জলে আর্সেনিক দূরীকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি এবং তার কার্যকারীতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মানব শরীরে আর্সেনিকের প্রভাব কি কি হতে পারে এবং প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচকরা আলোচনা করেন। ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন করলেই জলে আর্সেনিকের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় – পরিবেশবাদীদের এমন যুক্তিকে বৈজ্ঞানিক কারণ দ্বারা খন্ডন করা হয় এবং আর্সেনিক সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান কিভাবে সম্ভব তা বিস্তারিত আলোচিত হয় ও সমস্যাটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে চিন্তাভাবনা করার ও সচেতন হবার আহ্বান জানিয়ে আলোচনাটি সমাপ্ত হয়।

এবার 'বিজ্ঞান মনস্ক'র সদস্য ও শুভাকাঙ্খীদের দ্বারা একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন কারণে সঙ্গীতানুষ্ঠানটির মান অন্যান্য অনুষ্ঠানের মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি এবং আগামীদিনে সঙ্গীত চয়ন ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে আরও সচেতনতা দাবী করে।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল নাট্যানুষ্ঠান। 'বিজ্ঞান মনস্ক' সদস্যদের দ্বারা রচিত ও অভিনীত নাটক 'জলের নাম জীবন', মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকটির মূল বক্তব্য ছিল – জল সংকটের স্বরূপ। কৃত্রিম জল সংকট সৃষ্টি ক'রে বহুজাতিক সংস্থাগুলি কিভাবে বিশ্বব্যাপী জলের ব্যবসা ফেঁদেছে তা বোঝানোর প্রচেষ্টা রাখা হয়েছে নাটকটির মধ্য দিয়ে। নাটকটির আরও বিস্তারিত হবার দাবী রাখে।

অনুষ্ঠানে এলাকার বহু গণ্যমান্য মানুষজন, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন যেমন পরিপ্রশ্ন, বিজ্ঞান ও প্রকৃতি ইত্যাদি সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। ■

এভারেস্টের উচ্চতামাপক বিজ্ঞানীর দ্বিশতবর্ষ পূর্তি :

উপেক্ষিত গণিতজ্ঞ – রাধানাথ শিকদার

[জন্ম ১৮১৩, মৃত্যু ১৮৭০]

গণিতজ্ঞ ও জরিপ বিজ্ঞানী রাধানাথ শিকদারের নাম বহু মানুষের মন থেকে আজ প্রায় মুছে গেছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা পরিমাপ করা ছাড়াও রাধানাথের জীবন ছিল বৈচিত্র্যে ভরপুর, রাধানাথ শিকদার ১৮১৩ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন। ফিরিঙ্গী কমল বসু'র স্কুল ও হিন্দুস্কুলেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। পরবর্তীকালে ডিরোজিও'র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন।

ঊনিশ শতকের গোড়া থেকে বৃটিশ রাজ এদেশে এক জমি জরিপের কর্মসূচী গ্রহণ করে। এদেশে পাকাপাকিভাবে সাম্রাজ্য স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে এছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই কর্মকান্ডের নাম দেওয়া হয়েছিল গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক সার্ভে (জি টি এস) অর্থাৎ মহান ত্রিকোনোমিতিক জরিপ। এই কাজের নেতৃত্বে ছিল বৃটিশ রাজের সরাসরি অধীনস্থ সংস্থা সার্ভেয়র জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, যার প্রধান অধিপতি ছিলেন জর্জ এভারেস্ট। এই বিশাল কর্মকান্ডের জন্য জর্জ এভারেস্ট খুঁজছিলেন একজন অল্পবয়সী দক্ষ গণিতজ্ঞ এবং যিনি হবেন গোলকীয় ত্রিকোনোমিতিতে (স্ফেরিক্যাল ট্রিগোনোমেট্রি) দক্ষ। তদানীন্তন কলিকাতার হিন্দু কলেজের গণিত শিক্ষক ড: জন টিটলার তার সুদক্ষ ছাত্র, ঊনিশ বছরের যুবক, ডিরোজিয়ান শিক্ষায় শিক্ষিত রাধানাথ শিকদারের নাম সুপারিশ করেন।

১৮৩১ সালে ডিসেম্বরে নবীন রাধানাথ মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে জিটিএস-এর সদর দপ্তর দেরাদুনে 'কম্পিউটর' নিযুক্ত হন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রাধানাথ গণিত ও জরিপ শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করেন। জরিপশাস্ত্রে প্রচলিত পদ্ধতিগুলিতে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। প্রচলিত জরিপ পদ্ধতিগুলির পাশাপাশি রাধানাথ আবিষ্কার করেছিলেন অনেক নতুন জরিপ পদ্ধতি যা জরিপ শাস্ত্রকে বিকশিত করেছে। রাধানাথের উর্ধতন জর্জ এভারেস্ট রাধানাথের দক্ষতায় ভীষণভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন। একবার রাধানাথ জিটিএস-এর 'কম্পিউটর' পদ পরিত্যাগ করে ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হবার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে এভারেস্ট তাঁকে ছাড়তে চাননি। এমনকি এমন নির্দেশ জারি করেন যে কোনও সরকারী কর্মচারী তার উর্ধতনের সম্মতি ব্যাতীত অন্য কোনও বিভাগে যোগদান করতে পারবেন না। এদিকে ১৮৩৪ সালে জর্জ এভারেস্ট অবসর গ্রহণ করলে কর্নেল ওয়া অধিকর্তা নিযুক্ত হন।

কুড়ি বছর উত্তর ভারতে কর্মজীবন অতিবাহিত করার পর ১৮৫১ সালে রাধানাথকে কলকাতার 'মুখ্য কম্পিউটর' পদে বদলি করা হয়। এখানে জিটিএস-এর দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁকে আবহাওয়া দপ্তরের দায়িত্ব পালন করতে হোত। আবহাওয়া দপ্তরেও বিভিন্ন প্রচলিত পদ্ধতিগুলির বিকাশ সাধন করেন। বিশেষ করে কোনও জায়গায় বায়ুচাপের ব্যারোমিটারের মান-এর সাথে ঐ জায়গায় ফারেনহাইট তাপমাত্রা সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি মৌলিক পদ্ধতির আবিষ্কার করেন রাধানাথ যা দীর্ঘদিন একটি পরম পদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর) হিসাবে পরিগণিত হয়ে এসেছে।

ঐ সময় অধিকর্তা কর্নেল ওয়া, হিমালয় পর্বতমালার বিভিন্ন তুষারাবৃত চূড়ার উচ্চতা পরিমাপ করার জন্য রাধানাথকে নির্দেশ দেন। ঐ সময় হিমালয় পর্বতমালার চূড়াগুলিকে রোমান সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত করা হত। রাধানাথ দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টায় ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানকে একত্রিত করে দীর্ঘ হিসাব নিকাশ করে একটি প্রতিবেদন কর্নেল ওয়ার কাছে জমা দেন। সেই প্রতিবেদনে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে XV (১৫তম) চূড়াটিই হল সর্বোচ্চ। গণিত তথা গোলকীয় ত্রিকোনোমিতিতে অগাধ ব্যুৎপত্তি ব্যতীত

কাজটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। কর্নেল ওয়া কিন্তু রাধানাথের প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যগুলিকে সবিস্তারে যাচাই করে কয়েক বছর পর সরকারীভাবে ঘোষণা করেন XV সংখ্যায়িত শৃঙ্গটিই হ'ল পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

কর্নেল ওয়ার পূর্বতন অধিকর্তা জর্জ এভারেষ্ট শৃঙ্গের নামকরণের বিষয়ে একটি নিয়ম চালু করেছিলেন তা হ'ল শৃঙ্গগুলির নামকরণ স্থানীয় নামানুসারে করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে হ'ল ব্যতিক্রম। কর্নেল ওয়া তাঁর পূর্বতন অধিকর্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি 'এভারেষ্ট'-এর নামে রাখার প্রস্তাব দেন। বৃটিশ রাজ সম্মত হল, এভারেষ্ট স্বয়ং সম্মত হলেন, আর পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের আবিষ্কারক রাধানাথ শিকদার উপেক্ষিত হয়ে রইলেন। এখানেই উপেক্ষার শেষ নয়। ১৮৫১ সালে জরিপ বিভাগ জিটিএস-এর কাজকর্মের উপর একটি সার্ভে ম্যানুয়াল প্রকাশ করেন যার মুখবন্ধে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ঐ ম্যানুয়ালের প্রযুক্তিগত ও গাণিতিক পরিচ্ছেদগুলি রচনা করেছেন বাবু রাধানাথ শিকদার। অথচ ঐ ম্যানুয়ালের তৃতীয় সংস্করণে (যা প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে রাধানাথের মৃত্যুর পর), ঐ মুখবন্ধটি বাতিল করে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় বৃটিশ সার্ভেয়রদের এক অংশ প্রতিবাদ করেন। রাধানাথের বন্ধু স্বজন এই ঘটনাটিকে 'robbery of the dead' বলে আখ্যা দেন।

১৮৩৪ সালে জরিপ বিভাগের কর্মচারীদের উপর অনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে রাধানাথ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ ম্যাজিস্ট্রেট রাধানাথকে দু'শত টাকা জরিমানা করেন। এই ঘটনার বর্ণনা রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত 'The Bengal Spectator' পত্রিকায় উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮৫৪ সালে বন্ধু প্যারী চাঁদ মিত্রের সঙ্গে 'মাসিক পত্রিকা' নামক একটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন রাধানাথ। ঐ পত্রিকায় রাধানাথ নিয়মিত রচনা লিখতেন। নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণ বিষয়ক বহু রচনা তিনি সাবলীল ভাষায় লিখতেন।

১৮৬২ সালে রাধানাথ কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ সালে জার্মান লার্নেড সোসাইটি রাধানাথকে বিরল সম্মানে ভূষিত করে। ১৮৭০ সালে হুগলী জেলার চন্দননগরে রাধানাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বৃটিশ রাজ রাধানাথ শিকদারকে উপেক্ষা করবে এবং তাঁর প্রতিভাকে অশ্রদ্ধা করবে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ১৯৪৭ পরবর্তী ভারত তাঁকে কি সম্মান জানিয়েছেন? না, একমাত্র রাধানাথের একটি ডাক টিকিট প্রকাশ করা ব্যতীত তেমন কোন সম্মান তাঁকে জানানো হয়নি। একজন প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ হিসাবে একজন প্রতিবাদী ও সমাজ সচেতন মানুষ হিসাবে, বিজ্ঞান প্রেমী ও বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের হৃদয়ে রাধানাথ শিকদার বহুদিন বেঁচে থাকবেন।■

পত্রিকা যে সমস্ত স্টলে পাওয়া যায়

- **বুকমার্ক, কলেজস্ট্রীট, কোলকাতা**
- **মণীষা, কলেজস্ট্রীট, কোলকাতা**
- **টেলিফোন ভবনের বিপরীতের স্টলগুলিতে, কোলকাতা**
- **রাসবিহারী মোড়, কোলকাতা**
- **খড়দহ স্টেশন, উত্তর ২৪ পরগণা**
- **সোনারপুর স্টেশন স্টল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা**
- **বিদিশা পেপার হাউস, তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ডের বিপরীতে, শিলিগুড়ি**
- **ঠাকুরপুকুর ৩এ বাসস্ট্যান্ডের স্টল, কোলকাতা**
- **বেহালা ট্রামডিপোর স্টল, কোলকাতা**
- **পোড়া অশ্বত্থতলার মেজদার স্টল, কোলকাতা**
- **গড়িয়াহাট**
- **ঢাকুরিয়া**
- **গোলপার্ক**
- **গড়িয়া বাস স্ট্যান্ড**
- **যাদবপুর স্টেশন**
- **বেলঘরিয়া স্টেশন**
- **সোদপুর স্টেশন**

-ঃ বিজ্ঞানের খবর ঃ-

১৮ মার্চ

*ইদানিং গবেষণায় জানা গেছে, বিশ্বের গড় তাপমাত্রা যদি প্রতি ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায় তবে, বিধ্বংসী ঝড় যেমন "হারিকেন ক্যাটরিনা"-এর সংখ্যা ১০ গুণ বৃদ্ধি পাবে। (ইউরেকা অ্যালার্ট)

*নাসা'র মহাকাশযান 'কিউরিওসিটি রোভার' মঙ্গলের মাটিতে জলীয় খনিজ যেমন হাইড্রেটেড ক্যালসিয়াম সালফেট (জিপসাম)-এর সন্ধান পেয়েছে। এই জলীয় খনিজটি বিভিন্ন প্রকৃতির পাথরের খন্ডে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল "Tintina" এবং "Sutton Inlier" খন্ড বিশেষ। এছাড়াও 'Knorr' এবং "Wernicke" পাথরের গর্ত এবং শিরা (veins) বা স্ফীতি'র (nodules) মধ্যে পাওয়া গেছে। এগুলি পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে, ৪ শতাংশ জলের অংশ রয়েছে মাটির ২ ফুট (৬০ সেন্টিমি.) গভীরে। (নাসা)

১৯ মার্চ

*সুইস বিজ্ঞানীরা এক মেডিক্যাল স্ক্যানার আবিষ্কার করেছেন, যেটির সাহায্যে রক্ত সম্পর্কিত শারীরিক অবস্থা জানা যাবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। এটি চামড়ার তলায় প্রতিস্থাপন করা হয়। ২০১৭ সালের মধ্যে এটি বাজারে আসবে। (বিবিসি)

২১ মার্চ

*বিজ্ঞানীরা ত্রিমাত্রিক চশমার সাহায্য ছাড়া থ্রি-ডি ছবি দেখা যেতে পারে সেরকম একটি ভিডিও স্ক্রীনের আবিষ্কার করেছেন। (নেচার)

২৪ মার্চ

*বিজ্ঞানীরা ২৬টি জিনের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। এগুলি "oesophageal cancer"-এর জন্য দায়ী। এই আবিষ্কারের ফলে এই ব্যাধির মুক্তিলাভ সম্ভব হবে। (এএফপি ভায়া দি র স্টোরি)

৩ এপ্রিল

*টাইটান – শনি গ্রহের চন্দ্রে বা উপগ্রহে জটিল জৈব রাসায়নিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি টাইটানের বায়ুমন্ডলকে বিশ্লেষণ করে জানা গেছে। (নাসা টিম)

৪ এপ্রিল

*আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে তারা কয়েকটি জেনেটিক মার্কারস-কে চিহ্নিত করেছেন। এই কোষগুলি অ্যালঝেইমার'স রোগের প্রকোপ বাড়িয়ে তোলে। (বিবিসি)

৯ এপ্রিল

*ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকরা BRCA 2 জিনের পরিবর্তন ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এই জিনগত পরিবর্তন পুরুষের প্রসটেট্ ক্যান্সারের ঝুঁকি এবং প্রাবল্য বাড়িয়ে দেয় এবং মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যানসারের মাত্রা বাড়ায়। (বিবিসি)

১০ এপ্রিল

*বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে দৈহিক বেদনার পরিমাণ মাপার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। (ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো বোলডার)

*বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, SEC 24A জিনের প্রভাব কমিয়ে দিয়ে ইঁদুরের শরীরে কোলেস্টেরল-এর পরিমাণ ৪৫ শতাংশ কমানো সম্ভব। এই আবিষ্কারের ফলে স্ট্যাটিন্স-এর বিকল্প থেরাপি আবিষ্কার সম্ভব। (সায়েন্স নিউজ, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান)

১১ এপ্রিল

*আন্তর্জাতিক গবেষকরা আর্থ্রোপোড ও মেরুদন্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের কিছু মৌলিক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন যা জোরালোভাবে মানুষের স্নায়ুরোগের কারণ জানতে সাহায্য করবে। (সায়েন্স ডেইলি)

১২ এপ্রিল

বিজ্ঞানীরা প্রাচীন হোমিনিড অস্ট্রালোপিথেকাস সেডিবা-র খুলি পুনর্নির্মাণ করে আবিষ্কার করলেন যে এটি মানুষ ও এপ প্রজাতির প্রাণীর অদ্বিতীয় এক সংমিশ্রণ। (বিবিসি)

১৫ এপ্রিল

*আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে বানানো একটি কিডনী একটি জ্যান্ত ইঁদুরের শরীরে প্রতিস্থাপনে সক্ষম হলেন। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ 'রিজেনারেটিভ মেডিসিনের' ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। (বিবিসি/পপ সায়েন্স)

১৭ এপ্রিল

বিজ্ঞানীরা একটি বিশেষ ধরনের লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারী তৈরী করলেন যা বর্তমান ব্যাটারীর চেয়ে প্রায় হাজার গুণ শক্তিশালী এবং এটি চার্জডও হয় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প সময়ে। (এক্সট্রিম টেক)

*এম আই টি'র গবেষকরা আনুবীক্ষণিক স্তরে অস্থি'র গঠন নির্ণয় করতে পেরেছেন সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে সত্যিকারের অস্থিতন্তুর সিমুলেশন করে। এই গবেষণার ফলস্বরূপ অস্থিকে দৃঢ়তা দানকারী যৌগের সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া গেছে যা নতুন নতুন বায়েমিমেটিক পদার্থ তৈরীতে সাহায্য করবে। (পপুলার সায়েন্স)

২২ এপ্রিল

*জীববিজ্ঞানীরা অ্যান্টিবডির সাহায্যে অস্থিমজ্জার কোষ থেকে সরাসরি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কের কোষ রূপান্তরে সক্ষম হয়েছেন। এই আবিষ্কার স্নায়ু জনিত আঘাত ও রোগ নিরাময়ে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে এবং এব্যাপারে উন্নততর প্রতিরোধ ক্ষমতাও তেরী করবে। (সায়েন্স ডেইলী)

২৪ এপ্রিল

*সার্ন লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার থেকে নতুন পার্টিকেল কলিউশন তথ্য প্রকাশ করল যা থেকে ব্যাখ্যা করা যাবে কেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদি অবস্থায় ম্যাটার তার অ্যান্টিম্যাটার-এর ওপর derrivant থেকেছে। (ইউনিভার্স টুডে)

২৬ এপ্রিল

*গলিত লোহার উপর গবেষণাগারে পরীক্ষা করে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে পৃথিবীর কেন্দ্রমন্ডলের (কোর) তাপমাত্রা ৬০০০° সেলসিয়াস যা পূর্ববর্তী ধারণার চেয়ে প্রায় ১০০০° সেলসিয়াস অধিক। কেন পৃথিবীর চুম্বকক্ষেত্র এতটা শক্তিশালী তার ব্যাখ্যা দিতে হয়ত এই আবিষ্কার অনেক সাহায্য করবে। (ফিজিক্স অর্গ)

৬ মে

*আমেরিকান বিজ্ঞানীরা ত্বকের কোষ থেকে অস্থিকোষ রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছেন induced pluripotent পদ্ধতি দ্বারা। এটি বিশ্বে প্রথমবার যেখানে সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল ত্রিমাত্রিক অস্থি গঠনতন্ত্রকে এভাবে তৈরী করা সম্ভব হল। (ফক্স নিউজ)

১০ মে

*পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা নিদর্শনমূলকভাবে ৪০০ পিপিএম অতিক্রম করল যা কিনা মানব ইতিহাসে প্রথমবার। (বিবিস, NOAA)

১৫ মে

*ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের জন্য যে চারটি জিন মূলত দায়ী তাদেরকে ব্যাবুনের শরীরে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এই চিহ্নিতকরণ আশা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অসুখ প্রতিরোধের নতুন ওষুধ আবিষ্কারের পাথেয় হবে। (টেক্সাস বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট)

২১ মে

*হাইপোথ্যালামাস থেকে NF-KB নামক প্রোটিনটিকে রোধ (ব্লক) করে বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের জীবনকালকে ২০ শতাংশ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। (সিঙ্গুলারিটি হাব)

২২ মে

*জলবায়ু পরিবর্তনকে উদ্দেশ্য করে চীন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিল যে তারা ২০১৬ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমণ মাত্রার উপর ততোধিক নিয়ন্ত্রণ আনবে। (রিনিউ ইকনমি)

২৬ মে

*নতুন অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে গবেষকরা সাব সেলুলার স্ট্রাকচার-এর নিখুঁত ছবি তৈরী করতে পারবেন মিলি সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই। (নেচার মেথড)

২৭ মে

*মেক্সিকোর বার্জোস-এ প্রত্নতত্ত্ববিদরা ৫০০০ গুহাচিত্র আবিষ্কার করলেন যার বেশ কিছু ৬০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের সময়কার। (Io9)

২৯ মে

*রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা সাইবেরিয়ার একটি মৃত মহিলার জীবাশ্মে ম্যামথের রক্ত ও পেশীকোষ অত্যন্ত সংরক্ষিত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছেন। (RT)

*জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই প্রথমবার একটি ঘূর্ণায়মান নিউট্রন নক্ষত্রকে (নিউট্রন স্টার) হঠাৎ করে গতি হারিয়ে ফেলতে লক্ষ্য করলেন। (নাসা)

জুন ২০১৩

৫ই জুন

* হোমিনিড-এর দেহে টিউমারের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন গবেষকরা। তাঁরা জানিয়েছেন যে তাঁরা নিয়ানডারথ্যাল মানুষের শরীরে প্রথম টিউমারের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন যে মানুষটি আজ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার বছর আগে জীবিত ছিলেন। (সায়েন্স)

৬ই জুন

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথমবার এক কিডনীর রোগে

আক্রান্ত ব্যক্তির বাহুতে কৃত্রিম (বায়োইঞ্জিনিয়ার্ড) রক্তজালক বানিয়ে তা প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়। ঐ ব্যক্তিও কৃত্রিম শিরা বানাবার গবেষণাগারের একজন কর্মী। (সি এন ই টি)

১০ই জুন

*বিজ্ঞানীরা জানালেন যে পূর্বের ধারণা অনুযায়ী সৌরজগতের খুব কাছে অবস্থিত আলফা সেঞ্চুয়ারি বি নামক নক্ষত্রের চারিদিকে আবর্তনরত পৃথিবী সদৃশ গ্রহের অস্তিত্ব সম্ভবত জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হবে না। (অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল, নিউ ইয়র্ক টাইমস)

১১ই জুন

* বিশ্বের প্রথম ৫ গিগাহার্ৎজ কম্পিউটার প্রসেসর বাজারে আনলেন এ এম ডি কোম্পানি তাদের প্রোডাক্ট হিসাবে। (এ এম ডি)

১২ই জুন

*একটি নতুন গবেষণা জানাল যে ভাষা বিবর্তনের সাথে কোনো স্থানের সমুদ্রতল থেকে উচ্চতার (অলটিচিউড) এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেমন উচ্চতাবিশিষ্ট স্থানে বসবাসকারী মানুষের ভাষার মধ্যে ইজেক্টিভ সাউন্ডের ব্যবহার দেখা যায়। (সায়েন্টিফিক আমেরিকান)

১৪ই জুন

*বিজ্ঞানী সিনক্রোট্রন এক্স রশ্মির সাথে স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপি যুক্ত করে এক পারমাণবিক স্তরের অতি সূক্ষ্ম (হাইলি ডিটেইল) ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে তারা দেখতে পাচ্ছেন পরমাণুটির সঠিক স্থান কোথায় এবং এর ফলে পদার্থের রাসায়নিক চৌম্বক ধর্মের কথাও জানা যাবে। এই আবিষ্কারের প্রয়োগ অনেক রকম বিষয়, বিশেষ করে ন্যানোটেকনোলজিতে হতে পারে।

* আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এক মুখ্য ভ্রূণ প্রোটিনের খোঁজ পেয়েছেন যা জন্মের কিছু পরেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং ক্যানসারের অন্তিম দশায় রোগীর দেহে পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই আবিষ্কারে অন্তিম দশার (অ্যাডভান্স স্টেজ) ক্যানসার চিকিৎসায় এক নতুন দিকের উন্মোচন করবে।

১৭ই জুন

* পদার্থবিজ্ঞানীরা পরীক্ষালব্ধ পর্যবেক্ষণ থেকে জানিয়েছেন যে তাঁরা $Z_c(3900)$ নামক একটি নতুন সাব এটমিক কণার সন্ধান পেয়েছেন যা সম্ভবত প্রথম টেট্রাকোয়ার্ক হ্যাড্রন। (Swanson, Eric)(Physics)

১৮ই জুন

*গুগুল নামক কোম্পানী এক গুচ্ছ বিশেষ ধরনের বেলুন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে স্যাটেলাইটের প্রভাব নেই সেখানে তুলনামূলক স্বল্প খরচে তার বিহীন ইন্টারনেট পরিষেবা দিতে সক্ষম। (ন্যাশনাল জিওগ্রাফি)

২২শে জুন

* একটি গবেষণা দাবী করছে যে অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে রূপা কণা যুক্ত করলে তা নাকি রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে ১০ থেকে ১০০০ গুণ বেশী কার্যকর হবে। (বিবিসি)

২৩শে জুন

* বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জানিয়েছেন যে উদ্ভিদরাও মানুষের Circadian rhythm-এর মতই ব্যবহারিক শক্তির সাম্য (অ্যাডজাস্টমেন্ট) বজায় রাখতে জটিল গাণিতিক হিসাব করে। (রয়টার)

২৪শে জুন

*পৃথিবীর নিকটস্থ ১০০০০তম বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী। (এপি নিউজ)

২৬শে জুন

* আমেরিকান বিজ্ঞানীরা প্যারালাইজড ইঁদুরের সুষুম্নাকান্ড জনিত ক্ষতকে আংশিকভাবে নিরাময় করতে সম্ভব হলেন ঐ ক্ষতস্থানে স্নায়ুকোষ প্রতিস্থাপন করে। বর্তমানে ইঁদুরের শরীরে হলেও এই সাফল্য অদূর ভবিষ্যতে মানবদেহেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। (বিবিসি)

২৭শে জুন

* উত্তর ইংলন্ডে শেলে (কাদাপাথর) প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে যা কিনা শক্তির বাজারে ব্রিটেনকে প্রতিপত্তিশালী করতে তুলবে। (রয়টার্স)

* বিজ্ঞানীরা 'twisted light' ব্যবহার করে একধরনের অপটিক্যাল ফাইবার-এর নমুনা দিলেন যার মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ড ১ টেরাবিট তথ্য আদান প্রদান করা সম্ভব। তথ্য পাঠানোর প্রযুক্তিতে এ এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার। (সায়েন্স নিউজ, সায়েন্স ডেইলি)

*আমেরিকা এবং জার্মান বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের জলকে লবনমুক্ত করার এমন একটি অতিসাধারণ কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যার মাধ্যমে সামান্য তড়িৎক্ষেত্র ব্যবহার করেই লবনকে জল থেকে আলাদা করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে জটিল ও দামী ফিলটার মেমব্রেনের কোনও প্রয়োজনও পড়বে না। (সায়েন্স ডেইলি)

তৃতীয় বর্ষ ■ সংখ্যা ৩ ■ জুলাই ২০১৩ Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০ টাকা

সংগঠন সংবাদ

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রতিবাদী মিছিল

সাম্প্রতিক নারী নিগ্রহের ঘটনার জেরে সমস্ত দেশ জুড়ে বহু সংগঠিত ও অসংগঠিত মানুষ তাঁদের ক্ষোভ দেখিয়ে আসছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও ঘটনার অবসান হচ্ছে না। বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমস্যা সমাধানের চিরস্থায়ী সংগ্রামের রূপধারণ করতে পারছে না। এর কারণ হিসাবে সংগঠিত জনগণের নেতৃত্ব ও সেই নেতৃত্বের সমস্যা সমাধানের পথ সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সমস্যার মূলে পৌঁছে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে নারীকে পণ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করছে যে সমাজব্যবস্থা, তাকেই পাল্টে ফেলার ডাক দিয়ে অসম্ভবের ছন্দে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার হাতে স্লোগান দিতে দিতে আবাল বৃদ্ধবনিতা বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ। বিজ্ঞান মনস্ক সংগঠনের নেতৃত্বে এই মিছিল আয়োজিত হয়েছিল ৭ই জুলাই রবিবার, বেহালা-ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের কদমতলা মোড় থেকে। প্রায় ৫০ জনকে নিয়ে শুরু হওয়া মিছিল রোদ-বৃষ্টিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বুক চিতিয়ে নারী নির্যাতন ও শোষণ টিকিয়ে রাখার শোষণমূলক সামাজিক ব্যবস্থা বদলের স্বপ্নসন্ধানে নবপল্লী, খালপাড় ইত্যাদি অলি গলি ঘুরে অবশেষে থামল পোড়াশথতলা, জেমসলং সরণীর মোড়ে। সংগঠনের সম্পাদিকা শ্রীমতী নন্দা মুখার্জি তার বক্তব্যে কেন বিজ্ঞানের সার্বিক উন্নতিতে শোষণমূলক ব্যবস্থার অবসান করা দরকার এবং কেনই বা নারী নির্যাতনের সমাধান সার্বিক সামাজিক নির্যাতনকে অবসান না করে হওয়া সম্ভব নয় তা বলেন। পরের বক্তা সেই রেশ ধরে বলেন বর্তমানে যেমন নারী নির্যাতিত হন, তেমন পুরুষরাও হন। এ সমস্ত দেশের এক সার্বিক সমস্যা। তাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের উপর পুঁজিবাদের এই শোষণ-নিপীড়নকে বন্ধ করতে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনই একমাত্র সমাধান।

মিছিলে বিজ্ঞানমনস্ক'র কর্মী ছাড়াও অঞ্চলের বহু সাধারণ মানুষ দলে দলে যোগ দেন। সর্বোপরি ৭৬ জনের এই মিছিল স্থানীয় মানুষের কাছে নতুন ধরনের বার্তা দিল যা মানুষ বিচার করুন তা কতটা জরুরী। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলিকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার ঃ ৯৪৩২ ৩০০৮২৫
প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com